ইসলামের সামাজিক বিধান

আদাবুল মুআশারাত

হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

আদাবুল মু'আশারাত

মূল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিস : টঙ্গি দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

আদাবুল মু'আশারাত

মূল ঃ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মুমতায লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
মহররম ১৪৩০ হিজরী
জানুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0011-7

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম কথা

হামদ ও সালাতের পর পাঠক সমীপে নিবেদন এই যে, বর্তমান যুগে দ্বীনের পাঁচটি শাখার মধ্য থেকে সাধারণ মানুষ তো কেবলমাত্র দু'টি শাখাকে অর্থাৎ, আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, শরীয়তের আলেমগণ তৃতীয় শাখা অর্থাৎ, মুয়ামালাত তথা লেনদেন ও কায়-কারবারকেও দ্বীন বলে গ্রহণ করেছেন এবং তরীকতের মাশায়েখগণ পঞ্চম শাখা অর্থাৎ, আখলাক তথা আত্মিক চরিত্রের সংশোধনকেও দ্বীন বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু চতুর্থ শাখাটিকে অর্থাৎ, আদাবে মুয়াশারাত তথা সামাজিক শিষ্টাচারকে এ তিন শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকেই (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া), আর বিশ্বাসগতভাবে তো অধিকাংশই দ্বীনের বহির্ভূত ও সম্পর্কহীন গণ্য করেছে। (আর এ কারণেই অন্যান্য শাখার তো বিশেষভাবে বা সাধারণভাবে অর্থাৎ, ওয়াযের মধ্যে কম-বেশী শিক্ষাদান করা হয় ও আলোচনা করা হয়। কিন্তু এ শাখার নাম পর্যন্ত কখনো মুখে উচ্চারিত হয় না।) এ কারণে ইলম ও আমল উভয় দিক থেকে এ শাখাটি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে চলেছে।

আমার মতে পারস্পরিক মিল-মুহাব্বত ও ঐক্যের পিছনে (যার প্রতি শরীয়ত খুব তাকিদ করেছে এবং বর্তমানযুগে বিবেকের দাবীতেও এর পক্ষে খুব জোরে-শোরে চিৎকার করা হচ্ছে।) যে কমতি রয়েছে তার বড় একটি কারণ এই আদাবুল মুয়াশারাতের অভাব তথা সামাজিক শিষ্টাচারহীনতা। কারণ, এর (অনুপস্থিতির) ফলে পরস্পরে মন কষাকষি হয় ও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতার প্রধান ভিত্তি উদারচিত্ততা ও সহনশীলতার বিলুপ্তি ঘটায়। অথচ আদাবুল মুয়াশারাত তথা সামাজিক শিষ্টাচারের দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, এই ভ্রান্ত ধারণাকে আয়াত, হাদীস ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের উক্তি প্রত্যাখ্যান করে থাকে। নমুনা স্বরূপ তার কিছু উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا.

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয় যে, উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো।' (সূরা মুজাদালা–১১)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا.

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যদিও তা পুরুষের ঘর হোক—যদি তা বিশেষ নির্জন বাসগৃহ হয়) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ–পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো।' (সূরা নূর–২৭)

লক্ষ্য করুন! এ **আয়াতে নিজের পার্শ্বস্থ** লোকের **আরামের** প্রতি লক্ষ্য রাখার কিভাবে **নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।**

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ اَصْحَابَهٗ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সঙ্গে আহার করার সময় নিজের সাথীদের অনুমতি না নিয়ে এক সঙ্গে দু'টি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

লক্ষ্য করুন এ হাদীসে একটি অতি সাধারণ বিষয়ে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এটি অভদ্রতা এবং অন্যদের জন্য অপছন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন—

مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا

'যে ব্যক্তি (কাঁচা) পেঁয়াজ বা রসুন খাবে, সে যেন আমাদের থেকে (অর্থাৎ, মজলিস থেকে) দূরে থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম)

লক্ষ্য করুন, অন্যদের সামান্য কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে এ থেকে নিষেধ করেছেন।

তিনি আরো ইরশাদ করেন—'মেহমানের জন্য মেযবানের নিকট এত অধিক সময় অবস্থান করা হালাল নয়, যার দ্বারা মেযবান বিরক্ত হয়ে যায়।' (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসে এমন বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে যার দ্বারা অন্যের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

اِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتّٰى يُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهٗ وَاِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيَعْذَرْ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهٗ فَيَقْبِضُ يَدَهٗ وَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ.

'মানুষের সাথে আহার করার সময় নিজের পেট ভরে গেলেও অন্যেরা খাওয়া শেষ করার আগে হাত গুটিয়ে নিবে না। কারণ, এতে অন্যেরা লজ্জা করে হাত গুটিয়ে নিবে, অথচ হয়তো তাদের আরো খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' (ইবনু মাজাহ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমন কাজ করবে না, যার দ্বারা অন্য ব্যক্তি লজ্জা পায়। কতক মানুষ সহজাতভাবেই মানুষের সামনে কিছু গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে এবং তাতে তাদের কষ্ট হয়। বা তাদের থেকে মানুষের সামনে কিছু চাওয়া হলে দিতে অস্বীকার করতে ও আপত্তি জানাতে লজ্জাবোধ করে। যদিও প্রথম ব্যক্তির গ্রহণ করতে মন চায় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দিতে মন চায় না। এমন ব্যক্তিকে মানুষের সামনে কিছু দিবে না এবং মানুষের সামনে তার থেকে কিছু চাবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

عَنْ جَابِرٍ رض۔ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَافَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهٗ كَرِهَهَا.

একবার হযরত জাবির (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীর দরজায় হাজির হয়ে করাঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন—'কে'? তিনি উত্তর দিলেন—'আমি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্তি ভরে বললেন—'আমি, আমি।' (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, স্পষ্টভাবে কথা বলবে, যেন অন্যে কথা বুঝতে পারে। এমন অস্পষ্ট কথা বলা উচিত নয়, যা বুঝতে কষ্ট হয়—কারণ এতে অন্যকে জটিলতায় ফেলা হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—

عَنْ اَنَسٍ رض۔ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهٖ لِذٰلِكَ

সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউই ছিলো না। কিন্তু তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম এ জন্য দাঁড়াতেন না যে, তাঁদের জানা ছিলো যে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপছন্দনীয়। (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, বিশেষ কোন আদব বা সম্মান প্রদর্শন বা বিশেষ কোন খেদমত যদি কারো রুচিবিরুদ্ধ হয়, তাহলে তার সঙ্গে সেরূপ আচরণ করবে না। নিজের মন চাইলেও অন্যের চাহিদা ও ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিবে। কতক লোক কতক খেদমতের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে থাকে, এতে তারা বুযুর্গদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'এমন দুই ব্যক্তির

মাঝে—তাদের অনুমতি ছাড়া–বসা জায়েয নাই। যারা ইচ্ছা করে পাশাপাশি বসেছে।' (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয় বা বিরক্তির উদ্রেক হয়।

হাদীস শরীফে আরো এসেছে—

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ اَوْ ثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ.

'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁচি এলে তিনি নিজের মুখ হাত বা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতেন এবং আওয়াজ নীচু করতেন।' (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, নিজের পার্শ্ববর্তী লোকের প্রতি এতটুকু পর্যন্ত খেয়াল করবে যে, তার যেন উঁচু আওয়াজের কারণেও কষ্ট না হয়, আতংক সৃষ্টি না হয়।

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'আমরা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসতাম, তখন যে যেখানে জায়গা পেতাম সেখানেই বসে যেতাম।' (আবূ দাঊদ)

অর্থাৎ, মানুষের কাতার ভেদ করে বা কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সম্মুখে যেতো না। এ হাদীস দ্বারাও মজলিসের আদব প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে এতটুকু কষ্টও দিবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে 'মওকুফ'ভাবে, হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে 'মরফু'ভাবে এবং হযরত সাঈদুবনুল মুসায়্যিব (রাযিঃ) থেকে 'মুরসাল'ভাবে বর্ণিত আছে—

اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ

'রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর নিকট বেশী সময় বসবে না। অল্প সময় বসে তাড়াতাড়ি চলে আসবে।' (আবূ দাঊদ, রাযীন, বাইহাকী)

এ হাদীসে কত সূক্ষ্মভাবে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, কারো কষ্ট বা বিরক্তির কারণও যেন না হয়। কারণ, কোন কোন সময়

কারো বসে থাকার কারণে রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করতে বা পাও ছড়িয়ে দিতে বা কথাবার্তা বলতে এক ধরনের সংকোচ ও আড়ষ্টতা হয়ে থাকে। তবে যার বসে থাকার দ্বারা রোগীর আরাম হয়, সে এর ব্যতিক্রম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) জুমুআর গোসল জরুরী হওয়ার এ কারণই বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের প্রথম দিকে সিংহভাগ লোক দরিদ্র ও শ্রমজীবী ছিলো। ময়লা কাপড়ে ঘাম নির্গত হওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, তাই গোসল ওয়াজিব করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে ওয়াজিবের এ বিধান 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে যায়।

এ হাদীস দ্বারাও জানা গেলো যে, কারো দ্বারা যেন কারো কষ্ট না হয়, এ চেষ্টা করা ওয়াজিব।

নাসায়ী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'শবে বরাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা থেকে আস্তে ওঠেন—এ কারণে যে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ঘুমুচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙ্গে তাঁর যেন কষ্ট না হয়। আস্তে করে পবিত্র জুতা পরিধান করেন। আস্তে দরজা খোলেন।'

এ ঘটনায় ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রতি কি পরিমাণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, এমন কোন আওয়াজও যেন না করা হয়, যার দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তি হঠাৎ জেগে উঠে পেরেশান হয়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান ছিলাম এবং তাঁর ওখানেই অবস্থান করছিলাম। আমরা ইশার নামাযের পর যদি শুয়ে থাকতাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেরীতে তাশরীফ আনতেন, তখন মেহমানদের ঘুমন্ত ও জাগ্রত থাকার উভয়বিধ সম্ভাবনাই থাকতো। তাই তিনি জাগ্রত থাকার সম্ভাবনার কারণে সালাম করতেন ঠিকই, তবে আস্তে সালাম করতেন, যেন জেগে থাকলে শুনতে পায়, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম ভেঙ্গে না যায়।'

এ হাদীস দ্বারাও ঐ বিষয়ের গুরুত্বই বোঝা গেলো, যা ইতিপূর্বের হাদীসে বোঝা গেছে। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীসই বর্ণিত আছে। (যে

সমস্ত হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি, সেগুলো মিশকাত এবং তা'লীমুদ্দীন থেকে নকল করা হয়েছে।)

ফিকহের কিতাবে খাবার খাওয়া, পাঠদান বা ওযীফা ইত্যাদিতে রত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়ার কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ দ্বারা পরিস্কার জানা যায় যে, জরুরী কোন কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মনোযোগকে বিনা প্রয়োজন বিক্ষিপ্ত বা অন্যমনস্ক করা শরীয়তে অপছন্দনীয়। একইভাবে মুখের গন্ধের রোগীকে মসজিদে আসতে না দেওয়ার কথাও ফকীহগণ উদ্ধৃত করেছেন। যার দ্বারা পরিস্কার জানা যায় যে, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পথ ও মাধ্যমসমূহ বন্ধ করা একান্তই জরুরী। এ সমস্ত দলিলের প্রতি সার্বিকভাবে দৃষ্টি দিলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়ত অত্যন্ত তাকীদ সহকারে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে যে, কোন ব্যক্তির কোনও আচরণ বা কোনও অবস্থা যেন অন্যদের জন্য সামান্যতম পর্যায়েও কষ্ট, ক্লেশ, বোঝা, চাপ, সংকীর্ণতা, সংকোচ, বিরক্তি, মানসিক কষ্ট, অপছন্দনীয়, শংকা, অস্থিরতা, ভীতি, আতংক বা খটকার কারণ ও মাধ্যম না হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র তাঁর কথা ও কাজ দ্বারাই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করার উপর ক্ষান্ত করেননি, বরং কোন সাহাবীর উদাসীনতা ও অমনোযোগীতার ক্ষেত্রে এ সমস্ত আদবের উপর আমল করতে তাকে বাধ্য করেছেন এবং তার দ্বারা এ আদব বাস্তবায়ন করিয়ে এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন।

একবার এক সাহাবী একটি হাদীয়া নিয়ে তাঁর খেদমতে সালাম প্রদান ও অনুমতি গ্রহণ ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন—

اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ااَدْخُلُ

'পুনরায় বাইরে যাও, সালাম দাও এবং অনুমতি গ্রহণ করে ভিতরে প্রবেশ করো।'

মূলতঃ মানুষের সাথে সদাচরণের ভিত্তি ও মূল হলো একটি বিষয় অর্থাৎ, কারো দ্বারা কারো কোন কষ্ট ও আঘাত যেন না লাগে। বিষয়টিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'পরিপূর্ণ মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত (এর কষ্ট) থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।' (বুখারী)

যে কাজ দ্বারা কষ্ট হয়, তা আর্থিক বা দৈহিক খেদমতের রূপে হোক, বা আদব ও সম্মানের রূপে হোক—তাকে সমাজে সদাচরণ মনে করা হলেও তা অসদাচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, আরাম ও শান্তি—যা সদাচরণের প্রাণ—খেদমতের উপর—যা সদাচরণের খোসা সদৃশ—প্রাধান্য পাবে। কারণ, মগজ ছাড়া খোসা যে, বেকার তা বলাই বাহুল্য।

আদাবুল মু'য়াশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচার দ্বীনের 'শি'য়ার' বা নিদর্শন ও প্রতীক হওয়ার দিক থেকে ফরয 'আকীদা ও ইবাদতের থেকে যদিও পিছনে, কিন্তু (আকীদা ও ইবাদতের ক্রটি দ্বারা কেবলই নিজের ক্ষতি হয়, পক্ষান্তরে মু'য়াশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচারের ক্রটির ফলে অন্যদেরও ক্ষতি হয়। আর নিজের ক্ষতি নিজে করার চেয়ে অন্যের ক্ষতি করা অধিকতর মারাত্মক) এদিক থেকে মু'য়াশারাত আকীদা ও ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন কারণ তো অবশ্যই আছে, যার ফলে আল্লাহ তাআলা সূরা ফুরকানে—

اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.

অর্থ ঃ 'যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা (তর্কের) কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।'
(সূরা ফুরকান–৬৩)

আয়াতকে—যা উত্তম শিষ্টাচারের দিকনির্দেশনা দান করে—ফরয ইবাদত ও আকীদা সংক্রান্ত নামায, খোদাভীতি, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও তাওহীদের আলোচনার উপর অগ্রগণ্য করেছেন। ফরয ইবাদতসমূহের উপর হুসনে মু'য়াশারাত বা উত্তম শিষ্টাচারকে যে, এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা বিশেষ বিশেষ দিক থেকে দেওয়া হয়েছে। অন্যথা নফল ইবাদতের উপর সবদিক থেকে এর প্রাধান্য রয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে—

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُمِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَ صَدَقَتِهَا وَصَلٰوتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقْطِ وَلَاتُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে দু’জন মহিলার কথা আলোচনা করা হলো। তাদের একজন বেশী বেশী নামায–রোযা করতো। (অর্থাৎ, নফল নামায–রোযা। কারণ, নফল নামায–রোযাই বেশী বেশী করা যায়।) কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিতো। অপরজন বেশী নামায–রোযা করতো না। (অর্থাৎ, শুধু জরুরীগুলো পালন করতো।) কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিতো না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমজনকে দোযখী এবং দ্বিতীয়জনকে জান্নাতী বলেছেন।

উপরোক্ত দিক থেকে ‘আদাবে মুয়াশারাত’ বা সামাজিক শিষ্টাচারের বিষয় ‘মুয়ামালাত’ বা লেনদেন ও কারবারের উপর যদিও অগ্রগণ্য নয়। কারণ, মুয়ামালার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণেও অন্যদের ক্ষতি ও কষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু অপর একটি দিক থেকে ‘মুয়াশারাত’ ‘মুয়ামালাতে’র থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো, আম বা সাধারণ লোকেরা না হলেও খাস বা বিশেষ লোকেরা ‘মুয়ামালাত’কে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। আর ‘মুয়াশারাত’কে ‘আখাসসুল খাওয়াস’ বা অতি বিশিষ্ট লোকেরা ছাড়া অনেক খাস বা বিশিষ্ট লোকও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। যারা মুয়াশারাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারাও মুয়ামালাতের মত একে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস করে না। আর এ কারণে কার্যত তার প্রতি গুরুত্বও কম আরোপ করে থাকে।

আখলাকে বাতেনী বা আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও চরিত্রাবলীর ইসলাহ ও

সংশোধন ফরয ইবাদতের মতই গুরুত্বপূর্ণ। ইবাদতসমূহের উপর মুয়াশারাতের প্রাধান্য পাওয়ার যে পর্যায় উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য। মোটকথা, দ্বীনের এ শাখা অর্থাৎ, মুয়াশারাতের অধ্যায়টি দ্বীনের অন্যান্য শাখার চেয়ে কোনটার থেকে একদিক দিয়ে, আর কোনটার থেকে অন্য দিক দিয়ে—অগ্রগণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ব্যাপকভাবে আর কতিপয় বিশেষ লোকের আমলের দিক থেকে এর প্রতি মনোযোগ কম। আর যে নিজে এর উপর আমল করে সে তার সাথে সম্পৃক্ত ও ঘনিষ্ঠজনদের বা অসম্পৃক্তদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ও সংশোধন করা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে।

এ কারণে বহুদিন ধরেই আদাবে মুয়াশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত কিছু জরুরী আদব—যেগুলোর বেশীর ভাগ সময় মুখোমুখি হতে হয় এবং প্রয়োজন পড়ে—লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো। যদিও অধম দীর্ঘদিন ধরে নিজের মুতাআল্লিকীন ও মুরীদদেরকে এ ধরনের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে ধরপাকড় করে থাকি। যদিও এক্ষেত্রে আমার এ ভুলটুকু অবশ্যই হয়ে থাকে যে, কোন কোন সময় এ ব্যাপারে মেযাজের মধ্যে তেজস্বিতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা আমার এ ত্রুটি মাফ করে সংশোধন করে দিন। এবং বেশীর ভাগ ওয়াযের মধ্যেও এ সমস্ত বিষয়ের তা'লীম ও তাবলীগ করে থাকি, কিন্তু বিখ্যাত প্রবাদ—

اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ

অর্থাৎ, 'ইলম হলো শিকার, লেখার মাধ্যমে তাকে বন্দী করতে হয়"— অনুযায়ী লেখার উপকারিতা বলার মধ্যে কি করে হতে পারে? তাই লেখারই প্রয়োজন বোধ হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাজটি কেবলই বিলম্বিত হয়ে চলছিলো। কারণ, আল্লাহ তাআলার ইলমে এ কাজের জন্য এ সময়ই নির্দিষ্ট ছিলো। কোনরূপ বিন্যাস ছাড়া যে বিষয় যখন স্মরণ হবে বা সামনে আসবে, সে বিষয়েই লিখতে থাকবো। (আলহামদুলিল্লাহ, এখন সে সুযোগ হয়েছে। আমি প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য 'আদব' শব্দের শিরোনাম বসাবো) এ পুস্তিকা যদি

ছোটদেরকে বরং বড়দেরকেও পড়ানো হয়, **তাহলে ইনশাআল্লাহ** দুনিয়াতেই বেহেশতের স্বাদ নসীব হবে।

কবির ভাষায়—

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد
کسے را باکسے کارے نباشد

অর্থ ঃ 'বেহেশত এমন জায়গা, যেখানে কোন দুঃখ–কষ্ট নেই। কারো সাথে কারো কোন কাজ (ঝগড়া) নেই।'

وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَهُوَ خَيْرُ رَفِيْقٍ

'আল্লাহই তাওফীক দানের মালিক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

আদাবুল মুয়াশারাত

আদব-১ ঃ যখন কোন ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ করতে বা কিছু বলতে যাও, আর তার কোন ব্যস্ততার কারণে সুযোগ না থাকে—যেমন, সে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছে, বা ওযীফা পাঠ করছে, বা নির্জনে বসে কিছু লিখছে, বা শোয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে, বা লক্ষণের ভিত্তিতে এ ধরনের অন্য কোন অবস্থা জানতে পারো, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তির নিকট গেলে বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যথাসম্ভব তার ক্ষতি হবে, বা সে বিরক্ত হবে বা পেরেশান হবে—তাহলে এমন সময় তার সাথে সালাম-কালাম করো না। বরং ফিরে চলে যাও। আর যদি খুব বেশী জরুরী কথা থাকে, তাহলে আগে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও যে, আমি কিছু বলতে চাই। তারপর অনুমতিক্রমে কথা বলো। এতে বিরক্তি বা কষ্ট হয় না। আর না হয় অবসর সময়ের জন্য অপেক্ষা করো। যখন তাকে অবসর দেখতে পাও, তখন তার সাথে সাক্ষাত করো।

আদব-২ ঃ কারো অপেক্ষায় বসতে হলে এমন জায়গায় এবং এমনভাবে বসো না যে, সে জানতে পারে যে, তুমি তার জন্য অপেক্ষা করছো। এতে অনর্থক তার অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তার একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে। বরং তার থেকে দূরে এবং তার দৃষ্টির আড়ালে বসো।

আদব-৩ ঃ এমন সময় মুসাফাহা করো না, যখন অন্যের হাত এমন কাজে আটকা থাকে যে, হাত খালি করতে তার কষ্ট হবে। বরং সালাম করেই ক্ষান্ত হও। এমনিভাবে ব্যস্ততার সময় বসার জন্য অনুমতির অপেক্ষায় থেকো না, বরং নিজের থেকেই বসে যাও।

আদব-৪ ঃ কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা পরিষ্কারভাবে কথা বলে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ও ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলাকে আদব মনে করে। এতে করে সম্বোধিত ব্যক্তি অনেক সময় কথা বুঝতে পারে না বা ভুল বোঝে। ফলে তখন বা পরবর্তীতে পেরেশানী হয়। কথা খুব স্পষ্ট করে বলা উচিত।

আদব-৫ ঃ কোন কোন লোক বিনা প্রয়োজনে অন্য লোকের পিছনে গিয়ে বসে। এতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বা পিছনে নামাযের নিয়ত বাঁধে। এমতাবস্থায় সে নিজের জায়গা থেকে উঠতে চাইলে পিছনে নামায আদায়কারীর কারণে উঠতে পারে না। আটকে যায়। ফলে তার মনঃকষ্ট ও বিরক্তি হয়। এটা ঠিক নয়।

আদব-৬ ঃ কেউ কেউ মসজিদে এমন জায়গায় নামাযের নিয়ত করে যে, অতিক্রমকারীদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, দরজার সামনে বা পূর্ব দেওয়ালের সাথে একেবারে ঘেষে দাঁড়ায়। ফলে পিঠের দিক থেকে বের হওয়ারও সুযোগ থাকে না। সামনের দিক দিয়েও গুনাহের কারণে বের হতে পারে না। তাই এমন করবে না। বরং কেবলার দিকের দেওয়ালের নিকটে এক কোণায় নামায পড়বে।

আদব-৭ ঃ কারো নিকট গেলে সালাম দিয়ে, কথা বলে, সামনাসামনি বসে বা যে কোন উপায়ে তাকে তোমার আগমনের কথা জানিয়ে দাও। তাকে না জানিয়ে আড়ালে এমন জায়গায় বসো না যে, সে তোমার আগমন সম্পর্কে জানতে না পারে। কারণ, হতে পারে যে, সে এমন কোন কথা বলতে চায়, যা তোমাকে জানাতে চায় না। তার সম্মতি ছাড়া তার গোপন বিষয় অবগত হওয়া গুনাহের কাজ। বরং কোন কথার সময় যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তুমি জানছো না মনে করে সে কথা বলছে, তাহলে তুমি সাথে সাথে সে জায়গা ছেড়ে চলে যাও। বা যদি তোমাকে ঘুমন্ত মনে করে এমন কথা বলতে আরম্ভ করে তাহলে অনতিবিলম্বে তোমার জেগে থাকার কথা প্রকাশ করে দাও। তবে হাঁ, যদি তোমার বা অন্য কোন মুসলমানের ক্ষতি করার কোন কথা হতে থাকে, তাহলে তা যে কোনভাবে শোনা জায়েয আছে। যাতে করে ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়।

আদব-৮ ঃ এমন কোন ব্যক্তির নিকট কিছু চেয়ো না, যার ব্যাপারে লক্ষণ দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, তার কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও না করতে পারবে না। যদিও তা ধাররূপেই চাওয়া হোক না কেন। হাঁ, তবে যদি এ বিশ্বাস হয় যে, তার কষ্ট হবে না, বা কষ্ট হলে সে স্বাধীনভাবে না করে দিবে, তাহলে চাওয়ায় সমস্যা নেই। এই একই বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হবে,

কোন কাজে বলার ক্ষেত্রে বা কোন ফরমায়েশ করার ক্ষেত্রে বা কারো নিকট কারো পক্ষে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে। বর্তমানে অনেকেই এতে লিপ্ত।

আদব-৯ ঃ কোন বুযুর্গের জুতা উঠাতে চাইলে পা থেকে জুতা খোলার সময় জুতা হাত দিয়ে ধরো না। এতে অনেক সময় ঐ ব্যক্তি পড়ে যায়।

আদব-১০ ঃ কোন কোন সময় কিছু কিছু খেদমত অন্যের দ্বারা নেওয়া পছন্দ হয় না। তখন এরকম খেদমত করার জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। এতে যার খেদমত করা হয়, তার কষ্ট হয়ে থাকে। আর কোন্ খেদমত অন্যের দ্বারা নেওয়া পছন্দ নয়, তা যার খেদমত করা হবে, তার পরিষ্কার নিষেধ করার দ্বারা বা লক্ষণ দেখে জানা যাবে।

আদব-১১ ঃ কারো পাশে বসতে হলে এতো গা ঘেঁষে বসো না যে, তার মন বিচলিত হতে থাকে, আবার এতো দূরেও বসো না যে, কথাবার্তা বলতে কষ্ট হয়।

আদব-১২ ঃ কর্মরত ব্যক্তির নিকট বসে তার দিকে তাকিয়ে থেকো না। কারণ, এতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এবং মনের উপর চাপ অনুভব হয়। বরং এমন ব্যক্তির দিকে মুখ দিয়েও বসো না।

মেহমান হওয়ার আদব

আদব-১৩ ঃ যদি কারো নিকট মেহমান হও, আর তোমার খানা খাওয়ার ইচ্ছা না থাকে—তুমি খানা খেয়েছো, বা রোযা রেখেছো বা যে কোন কারণে খাওয়ার ইচ্ছা নেই—তাহলে সেখানে গিয়েই তাকে জানিয়ে দাও যে, আমি এখন খানা খাবো না। এমন যেন না হয় যে, সে খাবারের আয়োজন করলো। এজন্য সে কষ্টও করলো। তারপর খাওয়ার সময় হলে তুমি জানালে যে, খাবার খাবে না। তাহলে সমস্ত আয়োজন ও খাবার বৃথা নষ্ট হলো।

আদব-১৪ ঃ একইভাবে মেযবানের অনুমতি না নিয়ে মেহমানের জন্য অন্য কারো দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত নয়।

আদব-১৫ ঃ মেহমানের উচিত কোথাও গেলে মেযবানকে জানিয়ে

যাওয়া, যাতে খানা খাওয়ার সময় তাকে তালাশ করতে গিয়ে পেরেশানী না হয়।

আদব-১৬ ঃ কোন প্রয়োজনে কোথাও গেলে সুযোগ পাওয়া মাত্র সে প্রয়োজনের কথা বলে দিবে। দেরী করবে না। কোন কোন লোক আছে, যারা জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, এমনি দেখা করতে এসেছি। যখন ঐ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় এবং কথা বলার সুযোগ না থাকে, তখন বলে যে, আমার কিছু বলার ছিলো। এতে খুব কষ্ট হয়।

আদব-১৭ ঃ যখন কথা বলবে, সম্মুখে বসে কথা বলবে। পিছনে থেকে কথা বলায় কষ্ট হয়।

আদব-১৮ ঃ কোন জিনিস একাধিক লোকের ব্যবহারের হলে কাজ শেষে তা পূর্বের জায়গায় রেখে দিবে। এ বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্ব দিবে।

আদব-১৯ ঃ কোন কোন সময় ঘুমানো বা বসার জন্য এমন জায়গায় চৌকি বিছানো হয়—যেখানে সবসময় চৌকি বিছানো থাকে না—তাহলে কাজ শেষ হলে সেখান থেকে চৌকি উঠিয়ে একদিকে সরিয়ে রাখবে, যেন কারো কষ্ট না হয়।

আদব-২০ ঃ অন্যের চিঠি—যা তোমার বরাবর লিখছে না—দেখো না। সামনাসামনিও না—যেমন কেউ লিখছে, আর কেউ দেখছে এবং গোপনেও না।

আদব-২১ ঃ কারো সামনে কাগজপত্র রাখা থাকলে সেগুলো উঠিয়ে দেখো না। হয়তো সে ব্যক্তি কোন কাগজ তোমার থেকে গোপন রাখতে চায়। যদিও তা ছাপানো কাগজ হোক না কেন। কারণ, অনেক সময় এ কাগজ যে, তার কাছে আছে, একথা তুমি জানো—তা সে চায় না।

আদব-২২ ঃ যে ব্যক্তি খাবার খেতে যাচ্ছে বা তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে খাওয়ার জায়গা পর্যন্ত যেয়ো না। কারণ, এমতাবস্থায় বাড়ীওয়ালা চক্ষুলজ্জার কারণে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, অথচ ভিতর থেকে তার অন্তর চায় না। আর অনেক লোক এমন আছে, যারা তাড়াতাড়ি সে প্রস্তাব গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় সে বাড়ীওয়ালার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া খাবার খেলো। আর যদি প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাহলে বাড়ীওয়ালাকে হেয় করা হলো। তাছাড়া অতিরিক্ত লোক দেখে

বাড়ীওয়ালা প্রথম ধাক্কাতেই হোঁচট খায়, এটাও কষ্ট দেওয়া।

আদব-২৩ ঃ এমন ব্যক্তি, যার নিকট একবার কোন প্রয়োজনের কথা বলেছো, তার নিকট পুনরায় ঐ প্রয়োজনের কথা বলার সময়ও কথাটি পরিপূর্ণ বলা উচিত। ইঙ্গিতের উপর বা আগে বলেছো এর উপর ভরসা করে অসম্পূর্ণ কথা বলবে না। কারণ, হতে পারে যে, ঐ লোক পূর্বের কথা ভুলে গিয়েছে। ফলে সে ভুল বুঝবে বা মোটেই বুঝবে না, ফলে সে কষ্ট পাবে।

আদব-২৪ ঃ কোন কোন লোক পিছনে বসে এ উদ্দেশ্যে গলা খাঁকারী দেয় যে, খাঁকরানির শব্দ শুনে ঐ লোক আমাকে দেখবে এবং আমার সাথে কথা বলবে। এ ধরনের আচরণে মারাত্মক কষ্ট হয়ে থাকে। এর চেয়ে তো এটাই ভালো যে, সরাসরি সামনে এসে বসবে এবং যাকিছু বলার আছে বলবে। আর কর্মরত মানুষের সঙ্গে এটাও তখন করবে, যখন তীব্র প্রয়োজন দেখা দিবে। তা নাহলে উত্তম হলো, এমন জায়গায় বসে থাকবে, যাতে সে তার আগমনের কথাও জানতে না পারে। অন্যথায় এতে করেও অনেক সময় কষ্ট হয়ে থাকে। তারপর সে কাজ থেকে অবসর হলে কাছে এসে বসে যাকিছু বলার আছে বলবে এবং শুনবে।

আদব-২৫ ঃ যে ব্যক্তি দ্রুত পথ চলছে, মুসাফাহা করার জন্য তাকে আটকিও না। হতে পারে এতে তার কোন ক্ষতি হয়ে যাবে। একইভাবে এমন সময় তাকে খাড়া করে কথাও বলো না।

আদব-২৬ ঃ কতক লোক মজলিসে গিয়ে সবার সাথে পৃথক পৃথকভাবে মুসাফাহা করে। যদিও সবার সাথে তার পরিচয় না থাকে। এতে অনেক সময় ব্যয় হয়। তার মুসাফাহা শেষ হওয়া পর্যন্ত মজলিসের সমস্ত লোক আটকা পড়ে এবং পেরেশান হয়। সমীচীন হলো, যাকে উদ্দেশ্য করে এসেছে, তার সঙ্গে মুসাফাহা করে ক্ষান্ত করবে। হাঁ, অন্যদের সাথেও যদি পরিচয় থাকে, তবে সবার সাথে মুসাফাহা করায় দোষ নেই।

আদব-২৭ ঃ কারো নিকট কোন প্রয়োজনের কথা বলতে হলে বা কোন কিছুর আবদার করতে হলে—যেমন, কোন বুযুর্গের নিকট থেকে

কোন 'তাবাররুক' নিতে হলে—এমন সময় তা বলে দাও এবং আবেদন করো, যেন ঐ ব্যক্তি তা পুরা করার সময় পায়। অনেকে ঠিক বিদায় হওয়ার মুহূর্তে ফরমায়েশ করে । এতে বাড়ীওয়ালার অনেক কষ্ট হয়। তখন সময় থাকে সীমিত। কারণ, মেহমান যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। হতে পারে যে, এই সীমিত সময়ে তার সুযোগ নেই। সে কোন কাজে ব্যস্ত। তখন না তার নিজের কাজের ক্ষতি করতে চায়, না আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে চায়। ফলে তার অনেক কষ্ট হয়। আর এমন কাজ করা—যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়—জায়েয নেই। তাছাড়া 'তাবাররুক' চাওয়ার সময় এদিকেও লক্ষ্য রাখবে যে, তা যেন ঐ বুযুর্গের সম্পূর্ণ অতিরিক্ত জিনিস হয়। অন্যথায় সহজপন্থা হলো, ঐ জিনিস নিজের তরফ থেকে তাকে দাও এবং বলো যে, এটি আপনি ব্যবহার করে আমাকে দিয়ে দিবেন।

আদব-২৮ ঃ এমন অনেকে আছে, যারা কথার কিছু অংশ বলে খুব জোরে, আর কিছু অংশ বলে খুব আস্তে, যা শোনাই যায় না বা অস্পষ্ট ও অসম্পর্ণ শোনা যায়। উভয় অবস্থাতেই শ্রোতার ভুল বোঝার, দ্বিধা–সংশয় হওয়ার বা পেরেশান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উভয়ের ফল হলো কষ্ট পাওয়া। তাই পুরো কথা সুস্পষ্টরূপে বলা উচিত।

আদব-২৯ ঃ কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। কোন সন্দেহ–সংশয় থাকলে সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হওয়া উচিত। না বুঝে নিজের বুঝ মত কাজ করা উচিত নয়। অনেক সময় না বুঝে কাজ করায় যার কাজ করা হয় তার কষ্ট হয়ে থাকে।

আদব-৩০ ঃ নিজের কোন মুরুব্বী কোন কাজে বললে কাজ শেষ করে তাকে অবশ্যই অবহিত করা উচিত। অনেক সময় তারা প্রতীক্ষায় থাকেন।

আদব-৩১ ঃ কোথাও মেহমান হয়ে গেলে সেখানকার ব্যবস্থাপনায় মোটেও নাক গলাবে না। তবে মেযবান ব্যবস্থাপনার বিশেষ কোন কাজ তার উপর চাপালে সে কাজের ব্যবস্থাপনায় দোষ নেই।

আদব-৩২ ঃ নিজের চেয়ে বড় কারো সাথে অবস্থান করলে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন কাজ করা উচিত নয়।

আদব-৩৩ ঃ এক আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করা হলো—তুমি কবে

যাবে? সে উত্তর দিলো—যখন হুকুম করবেন। তখন তাকে শিখানো হলো যে, এ উত্তরের কোন অর্থ নেই। তোমার কি অবস্থা, কি সুবিধা–অসুবিধা আছে, কি পরিমাণ সময় তোমার হাতে আছে, আমি তার কি জানি? উচিত হলো, উত্তরে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দেওয়া। যদি খুব বেশী আদব, আনুগত্য ও সমর্পণের প্রাবল্য থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে বলবে যে, আমার ইচ্ছা তো এই বাকী আপনি যেমন হুকুম করেন। মোটকথা, এমন উত্তর দিও না যে, জিজ্ঞাসাকারীর উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

আদব–৩৪ ঃ একজন তালিবে ইলম অন্য এক ব্যক্তির প্রসব বেদনার তাবিয চাইলো। তখন তাকে তালিম দেওয়া হলো যে, তালিবে ইলমের জন্য অন্যদের দুনিয়াবী হাজত পেশ করা উচিত নয়। কেউ তাকে এমন ফরমায়েশ করলে সে অক্ষমতা জানিয়ে বলবে যে, আমাকে এ থেকে মাফ করুন। এটি আদবের খেলাফ।

আদব–৩৫ ঃ একজন তালিবে ইলম মেহমান হয়ে আসে। সে ইতিপূর্বেও এসেছিলো এবং অন্য জায়গায় অবস্থান করেছিলো। এবার এখানে থাকার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু আমাকে বলেনি যে, এবার এখানে অবস্থান করবো। তাই তার জন্য খানা পাঠানো হয়নি। পরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, সে আমার এখানে অবস্থান করবে, তখন তার জন্য খানা আনানো হয় এবং তাকে বুঝিয়ে দেই যে, এমতাবস্থায় এখানে যে, থাকবে তা নিজের থেকে বলা উচিত ছিলো। না বললে বুঝবো কি করে। তাছাড়া ইতিপূর্বে অন্য জায়গায় অবস্থান করেছিলে বিধায় আমি নিজেও জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন আসেনি।

আদব–৩৬ ঃ এক মেহমান অপর এক মেহমানকে বলেছিলো যে, 'খাবার তৈয়ার হয়েছে।' অথচ মেহমানের এসব অনর্থক কাজ ও কথার কি প্রয়োজন?

আদব–৩৭ ঃ এক মেহমান মেযবানের খাদেমকে এ বলে পানি চায় যে, 'পানি নিয়ে এসো।' তখন হযরত বলেন যে, আদেশের সুরে কাজে বলা মোটেই উচিত নয়। এটি অসদ্ব্যবহার। এভাবে বলা উচিত যে, 'একটু পানি দিবেন?'

আদব-৩৮ ঃ হাদীয়া দেওয়ার একটি আদব এই যে, যাকে হাদীয়া দিচ্ছে, তার কাছে কিছু চাইতে হলে তখন হাদীয়া দিবে না। কারণ, এমতাবস্থায় প্রার্থিত বস্তু দিতে ঐ ব্যক্তি বাধ্য হয়, আর দিতে না পারলে অপমানিত হয়। একইভাবে অনেকে সফরের হালতে এতো অধিক পরিমাণে হাদীয়া দেয় যে, তা নিয়ে যাওয়া কষ্ট হয়ে যায়। যদি এতই আগ্রহ থাকে তাহলে তার অবস্থান স্থলে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিবে।

আদব-৩৯ ঃ প্রথম সাক্ষাতেই শাইখের (শারীরিক) খেদমত করায় মারাত্মক মানসিক চাপ হয়ে থাকে। খেদমতের ইচ্ছাই যদি থাকে তবে আগে অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ো।

আদব-৪০ ঃ মজলিসে বিশেষ কোন বিষয়ে যদি আলোচনা হতে থাকে তাহলে নবাগতের সালাম করে নিজের দিকে মনোযোগী করে কথার মাঝে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। বরং সবার চোখ এড়িয়ে বসে পড়বে পরে সুযোগমত সালাম ইত্যাদি করতে পারবে।

আদব-৪১ ঃ মেহমানের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করে খাওয়ার জন্য তাকাল্লুফ করা এবং পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়।

আদব-৪২ ঃ অনর্থক পশ্চাতে বসার দ্বারা ভীষণ মানসিক চাপ অনুভব হয়। তীব্র প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তার সম্মানার্থে ওঠা যায় না। তাই এভাবে বসা উচিত নয়।

আদব-৪৩ ঃ একজনের জুতা রাখা আছে, সেখান থেকে তার জুতা হটিয়ে নিজের জুতা রেখে মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়া উচিত নয়। যেখানে যার জুতা রাখা আছে, তা তারই হক। সে ওখানে এসেই তার জুতা খুঁজবে, সেখানে জুতা না পেয়ে সে পেরেশান হবে।

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد

অর্থ ঃ 'বেহেশত এমন জায়গা যেখানে কোন কষ্ট থাকবে না।'

এভাবে জীবন কাটানো উচিত।

আদব-৪৪ ঃ ওযীফা পড়ার সময় কাছে বসে অপেক্ষা করে মনকে আকৃষ্ট করার দ্বারা ওযীফাতে বিঘ্ন ঘটে। তবে নিজের জায়গায় বসে থাকায় কোন অসুবিধা নেই।

আদব-৪৫ ঃ সবসময় সহজ–সরলভাবে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে। কৃত্রিমভাবে ভূমিকা টানবে না।

আদব-৪৬ ঃ বিনা প্রয়োজনে কারো মধ্যস্থতায় পয়গাম পাঠাবে না। যা কিছুর বলার আছে, নিজে সরাসরি বলবে।

আদব-৪৭ ঃ হাদীয়া গ্রহণ করার পর হাদীয়া দাতার সামনেই ঐ হাদীয়াপ্রাপ্ত জিনিস জনকল্যাণমূলক কাজে চাঁদা হিসেবে দেওয়াও হাদীয়াদাতার মনঃকষ্টের কারণ হয়। তাই (সে জিনিস চাঁদা হিসেবে দিতে হলে) এমন সময় দিবে, যাতে সে জানতে না পারে।

আদব-৪৮ ঃ এক গ্রাম্য লোক আমার সাথে কিছু কথা বলছিলো। কথার মাঝে সে কিছু অশালীন কথাও বলছিলো। মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। আমি তখন ঐ ব্যক্তিকে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলি যে, তুমি তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কোথায় পেলে? তোমরা মানুষদেরকে সন্ত্রস্ত করো। আমার মজলিসকে ফেরাউনের মজলিস বানাও। যদি বলো যে, সে বেয়াদবী করছিলো তাহলে বেয়াদবী থেকে বাধা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকেও তো মুখ দিয়েছেন। তুমি কেন নাক গলাও। আর গ্রাম্য লোকটিকে বললাম যে, তোমার যা বলার আছে, স্বাধীনভাবে বলো।

আদব-৪৯ ঃ কোন বুযুর্গের সাথে তার কোন মুরীদকেও দাওয়াত দিতে চাইলে ঐ বুযুর্গকে বলবে না যে, অমুককেও নিয়ে আসবেন। কারণ, অনেক সময় মনে থাকে না। তাছাড়া তার দ্বারা নিজের কাজ নেওয়া আদবেরও খেলাপ। বরং বুযুর্গের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মুরীদকে নিজেই বলবে। আর মুরীদেরও উচিত, নিজের পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করে তবে দাওয়াত কবুল করা।

আদব-৫০ ঃ এক ব্যক্তি পানি পড়ার জন্য গ্লাস ভরে পানি আনতো। কখনো নিজের জন্য পানি পড়া নিতো, আর কখনো অন্যের জন্য নিতো। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করলে বলতো না যে, এখন কার জন্য পানি পড়া নিচ্ছে। তাই তাকে বুঝিয়ে দেই যে, আমার তো পার্থক্য করার জন্য ইলমে গায়েব জানা নাই বা কোন পারিভাষিক শব্দও নির্দিষ্ট নাই যে, সেই শব্দ দেখে বুঝবো যে, কার জন্য পানি পড়া নিচ্ছো। প্রত্যেকবার

জিজ্ঞাসা করার বোঝা আমার উপর চাপানো আদবের খেলাপ। গ্লাস রেখে নিজের থেকেই বলে দিবে যে, অমুকের জন্য পানি পড়া নিবো।

আদব-৫১ ঃ অনেক লোক শুধু এতটুকু বলে যে, একটি তাবীজ দিন। জিজ্ঞাসা না করলে বলে না যে, কিসের তাবীজ। এতেও কষ্ট হয়।

আদব-৫২ ঃ এক ব্যক্তি কিছু আটা এনে বলে—এটি এনেছি। কিন্তু কেন এনেছে, তা বলে নাই। ঐ আটা ফেরত পাঠিয়ে দেই এবং বলি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আটা দিয়ে নিজের থেকে বলবে না যে, আমার জন্য এনেছো, নাকি মাদরাসার জন্য, ততক্ষণ পর্যন্ত এ আটা নেওয়া হবে না।

আদব-৫৩ ঃ এস্তেঞ্জাখানায় যাওয়ার পথে দেখি যে, একজন তালিবে ইলম সেখানে পেশাব করছে। তার কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আমি একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে যাই। যখন অনেক দেরী হলো, তখন এগিয়ে গিয়ে দেখি ঐ তালিবে ইলম পেশাব শেষ করে ঢিলা নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন তাকে আমি বুঝিয়ে দেই যে, এখন এ জায়গা আটকিয়ে রাখার কি প্রয়োজন রয়েছে? এখান থেকে সরে গিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা দরকার ছিলো। অনেক লোক সংকোচের কারণে ঐ জায়গা খালি হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। তারা অন্য লোক থাকাবস্থায় এস্তেঞ্জাখানায় যেতে লজ্জাবোধ করে।

আদব-৫৪ ঃ এক ব্যক্তিকে দেখি যে, ঢিলা নিয়ে সাধারণের চলাচলের পথে হাঁটাহাঁটি করছে। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, যতদূর সম্ভব মানুষের চোখের আড়ালে দূরে গিয়ে এস্তেঞ্জা শুকানো উচিত।

আদব-৫৫ ঃ আমার একবার মাদরাসার একটি কিতাবের প্রয়োজন হয়। কিতাবটি আমার এক বন্ধুর নিকট আমানত ছিলো। সে ঐ সময় উপস্থিত ছিলো না। আমি তার বসার জায়গায় কিতাবটি খোঁজ করাই, কিন্তু পাওয়া যায় না। আমি নিজে গিয়ে তালাশ করেও পেলাম না। হঠাৎ একজনের চোখে পড়ে যে, একজন তালিবে ইলম ওখানে বসে একটি কিতাব 'তাকরার' করছে, আর মাথার নীচে মাদরাসার সেই কিতাবটি বালিশরূপে রেখেছে। মাদরাসার কিতাবটি তার কিতাবের আড়ালে ছিলো বলে দেখা যাচ্ছিলো না। হঠাৎ তা চোখে পড়ার ফলে চেনা যায় এবং পাওয়া যায়। ঐ তালিবে ইলমকে তিরস্কার করে বলি

যে, না জানিয়ে কোন জিনিস ব্যবহার করা নাজায়িয তো বটেই, তাছাড়া তোমার কারণে এতোগুলো মানুষ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পেরেশান হলো। এমন আচরণ আর কখনো করো না।

আদব-৫৬ ঃ তোমার কোন মুরুব্বী কোন কাজ করতে বললে তা সম্পাদন করে তাকে অবহিত করা উচিত। যাতে ঐ মুরুব্বীর সেই কাজের অপেক্ষায় কষ্ট না হয়।

(টীকা ঃ এ নম্বর এবং বিশ নম্বরের বিষয়বস্তু একই। বাহ্যতঃ ভুলে এই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।—মুহাম্মাদ শফী')

আদব-৫৭ ঃ পাখা দ্বারা বাতাসকারীদেরকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম এই যে, পাখা হাত বা কাপড় দিয়ে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিবে। কারণ, অনেক সময় পাখা বিছানার উপর পড়ে থাকার ফলে তাতে ধুলাবালি, কখনো মাটি, চুনা বা পাথরের ছোট টুকরা লেগে থাকে। পাখা নাড়া দিলে সেগুলো চোখে মুখে বা অন্য কোন অঙ্গের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে কষ্ট হয়।

দ্বিতীয়, হাত এমন বরাবর রাখে, যেন মাথায় বা অন্য কোথাও বাড়ি না লাগে। আবার এতো উঁচুতেও রেখো না যে, বাতাসই না লাগে। এতো জোরেও পাখা চালিয়োনা যে, যাকে বাতাস দিচ্ছো তার কষ্ট হয়।

তৃতীয়, এদিকে লক্ষ্য রাখবে যে, পাশে উপবিষ্ট কারো যেন কষ্ট না হয়। যেমন, পাখা তার মুখে গিয়ে আঘাত করলো, বা তার সম্মুখে দেওয়ালের মত আড়াল হয়ে গেলো।

চতুর্থ, যাকে বাতাস করছো, তিনি উঠতে চাইলে তার প্রতি খেয়াল রেখে আগেই পাখা সরিয়ে ফেলো, যেন তাঁর (গায়ে) আঘাত না লাগে।

পঞ্চম, কাগজ বা অন্য কিছু বের করতে আরম্ভ করলে পাখা ঝুলানো বন্ধ করে দাও। মেশিনের মত একাধারে ঝুলাতে থেকো না।

আদব-৫৮ ঃ কারো কারো জন্য এমন ব্যক্তি থেকে হাদীয়া নেওয়া খুব কষ্টকর হয়, যার কোন প্রয়োজন তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন, দু'আ করানো, তাবিজ নেওয়া, সুপারিশ করানো, মুরীদ হওয়া বা এ জাতীয় অন্য যে কোন কাজ। তাই এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। হাদীয়া তো

কেবলই মুহাব্বতের খাতিরে হওয়া উচিত। যার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকবে না। যদি কোন প্রয়োজন থাকেই তবে তাকে এর সাথে মেলাবে না। বরং যখন প্রয়োজনের কথা বলবে, তখন যেন এ সন্দেহ না হয় যে, ঐ হাদীয়া এ কারণে দিয়েছিলো। আর যখন হাদীয়া দিবে, তখন যেন এ সন্দেহ না হয় যে, এ হাদীয়া কোন প্রয়োজনের খাতিরে দিয়েছে।

আদব-৫৯ ঃ এক ব্যক্তি ফজর নামাযের পূর্বে আমি ঘর থেকে এসে ওযু করবো একথা চিন্তা করে আমার জন্য লোটায় পানি ভরে তার উপর আমার মেসওয়াক রেখে প্রস্তুত করে রাখে। যখন আমি মসজিদে আসি, ঘটনাচক্রে তখন আমার ওযু ছিলো। তাই আমি সোজা মসজিদে চলে আসি। মসজিদে আসার পর হঠাৎ করে ঐ লোটার উপর আমার চোখ পড়ে। আমার মেসওয়াক চিনে বুঝতে পারি যে, ঐ লোটা আমার জন্য ভরে রাখা হয়েছে। যে বদনা ভরে রেখেছে আমি তাকে খোঁজ করি। অনেক পেরেশানীর পর যে রেখেছিল, সে নিজেই স্বীকার করে। আমি সে সময় সংক্ষেপে এবং নামাযের পর বিস্তারিতভাবে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাই যে, দেখো! তুমি শুধু এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, আমি ওযু করবো, লোটা ভরে রেখে দিয়েছো। কিন্তু এ সম্ভাবনার কথা তোমার মনে হলো না যে, ওযু থাকতেও পারে। অথচ যে সম্ভাবনার কথা তুমি ভেবেছিলে বাস্তবে তা ভুল প্রমাণিত হলো। আর এ দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বাস্তব প্রমাণিত হলো। এমতাবস্থায় যদি হঠাৎ আমার চোখ লোটার উপর না পড়তো, এ লোটা এমনই ভরা অবস্থায় থেকে যেতো। অন্য কেউ তা ব্যবহারও করতে পারতো না। কারণ, একে তো লোটা ছিলো ভরা যা এ কথার নিদর্শন ছিলো যে, কেউ ব্যবহারের জন্য এটি ভরে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, তার উপর মেসওয়াক থাকা একথার নিশ্চিত আলামত ছিলো। বিধায়, তুমি এমন একটি জিনিসকে বিনা প্রয়োজনে আটকিয়ে রেখেছিলে, যার সঙ্গে জনসাধারণের উপকারিতা জড়িত রয়েছে। যা এ বদনা তৈরীর উদ্দেশ্য এবং এর ওয়াকফকারীর নিয়তের পরিপন্থী কাজ, তাই এটা কি করে জায়েয হতে পারে? এতো হলো লোটা সংক্রান্ত কথা।

এখন হলো মেসওয়াক সংক্রান্ত কথা। তুমি মেসওয়াকটি বিনা প্রয়োজনে সংরক্ষিত জায়গা থেকে সরিয়ে এনে এমন এক জায়গায়

রেখেছো, যা নিরাপদ নয়। মেসওয়াক রেখে তার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাও করোনি যে, কাজ শেষ হলে তা এনে পুনরায় পূর্বের জায়গায় রেখে দিবে। কারণ, মিসওয়াকটি লোটার উপর রেখে দিয়ে তুমি মনে করেছো যে, আমি সেটি ব্যবহার করে উঠিয়ে রাখবো। ফলে এটা হারিয়ে যাওয়ার আশংকা ছিলো। তোমার এ খেদমত এতোগুলো নাজায়েয কাজ এবং কষ্টের কারণ হলো। ভবিষ্যতে কখনোই আর এমন করবে না। হয় অনুমতি নিয়ে এমন করবে, অথবা যখন দেখবে যে, ওযু করার জন্য উদ্যত হয়েছে, তখন এমন করায় কোন ক্ষতি নেই। অন্যথায় উলটপালট খেদমতের দ্বারা আরামের পরিবর্তে উল্টো আরো কষ্ট হয়ে থাকে।

লতীফা ঃ এই একই অবস্থা বিদআতেরও। তার বাইরের আকৃতি তো ইবাদতের হয়ে থাকে, যেমন এ কাজটির বাইরের আকৃতি ছিলো খেদমতের। কিন্তু বিদআতের ভেতরে অনেক ক্ষতি ও দোষ লুকায়িত থাকে, যেগুলো স্বল্প বুঝের লোকেরা জানে না। যেমন, এই খেদমতের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খারাপ দিকসমূহ ছিলো, যা খেদমতকারী বুঝতে পারেনি।

আদব-৬০ ঃ একজন ছাত্র মাদরাসায় থাকাবস্থায়ই একটি চিরকুটে কাপড়ের প্রয়োজনের কথা লিখে অন্য ছাত্রের হাতে পাঠিয়ে দেয়। আবেদনকারীকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। সে বললো, আমার একটি কাজ ছিলো, তাই অন্যের হাতে পাঠিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে তাকে উপদেশ দেই—

একে তো এর মধ্যে আদবের কমতি রয়েছে যে, সবসময় এ জায়গায় থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র একটি কাজ দেখা দেওয়ার কারণে লজ্জা ও সংকোচের কারণেও নয় (কারণ, এটাও এক ধরনের অপারগতা) নিজে এসে কাপড় না চেয়ে অন্যের হাতে চেয়ে পাঠিয়েছো। যা সমকক্ষদের মধ্যে চলে। কিন্তু বড়দের সাথে এমন করা বেয়াদবী।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে অনাগ্রহ প্রকাশ পায়, যেন বেগার খাটার ন্যায় তুমি এড়িয়ে গেলে।

তৃতীয়ত, এতে অন্যের দ্বারা খেদমত নেওয়া হলো, এখন থেকেই খেদমত নেওয়া শিখছো। তাকে আরো বলি যে, এ বেয়াদবীর শাস্তি

হলো, চার দিনের জন্য এ দরখাস্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি। তারপর নিজের হাতে দরখাস্ত দিবে। সুতরাং চতুর্থ দিন সে নিজ হাতে পুনরায় দরখাস্ত দেয় এবং খুশি মনে তা গ্রহণ করা হয়।

আদব-৬১ ঃ কয়েকবার কয়েকজনকে শাসন করে বলি যে, খুব পরিষ্কার ভাষায় কথা বলবে, যেন বুঝতে ভুল না হয়।

আদব-৬২ ঃ বর্তমান যুগের সুপারিশ করা হলো, চাপ সৃষ্টি করা এবং বাধ্য করা। সুপারিশ করার নামে নিজের প্রভাব খাটিয়ে অন্যদের উপর শক্তি প্রয়োগ করা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। যদি সুপারিশ করো, তাহলে এমনভাবে করো, যেন যার নিকট সুপারিশ করছো, তার স্বাধীনতার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। এ রকম সুপারিশ করা জায়েয, বরং সওয়াবের কাজ।

আদব-৬৩ ঃ একইভাবে কারো প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে কাজ আদায় করা, যেমন কোন বড় মানুষের সাথে আত্মীয়তা আছে—এখন তার কোন ভক্ত বা প্রভাবাধীন লোকের নিকট নিজের কোন প্রয়োজন নিয়ে গেলে এবং লক্ষণ দেখে জানা গেলো যে, সে খুশিমনে এ প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে না, বরং শুধুমাত্র ঐ বড় মানুষের সম্পর্ক বা প্রভাবের কারনে—অর্থাৎ তার অসন্তুষ্টির ভয়ে করে দেবে। তাহলে এভাবে কাজ আদায় করা বা কাজের ফরমায়েশ করা হারাম।

আদব-৬৪ ঃ এক ব্যক্তি তাবিজ চাইলে তাকে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আসার কথা বলে দেই। সে অন্য সময়ে এসে তাবিজ চায় এবং বলে যে, আমাকে তুমি আসতে বলেছো, তাই এসেছি। কিন্তু একথা প্রকাশ করেনি যে, কখন আসতে বলেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, ভাই কোন্ সময় আসতে বলেছিলাম? তখন সে ঐ সময়ের কথা বললো। আমি বললাম যে, এখন তো অন্য সময়। যখন আসতে বলেছিলাম তখন আসা উচিত ছিলো। সে কোন সমস্যার কথা বললো। আমি বললাম, তোমার যেমন তখন সমস্যা ছিলো, এখন আমারও তেমন সমস্যা রয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, সব সময় এক কাজের জন্যই বসে থাকবো, আমার নিজের কোন কাজ করবো না?

আদব-৬৫ ঃ একজন ছাত্র অন্য একজন ছাত্রের মারফত একটি

মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, আর নিজে লুকিয়ে শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে আমি তাকে দেখে ফেলি। কাছে ডেকে এনে ধমকিয়ে বুঝিয়ে দেই যে, চোরের মত লুকিয়ে শোনার কি অর্থ? কেউ কি এখানে আসতে নিষেধ করেছে? আর যদি শরমই করে তাহলে তোমার প্রেরিত লোকের নিকট থেকে উত্তর জিজ্ঞাসা করে নিতে। লুকিয়ে কারো কথা শোনা দোষণীয় এবং গুনাহের কাজ। কারণ, হতে পারে যে, বক্তা এমন কোন কথা বলবে, যা লুকায়িত ব্যক্তির নিকট থেকে গোপন করতে চায়।

আদব–৬৬ ঃ এক ব্যক্তি হাতে টানা পাখা ঝুলাচ্ছিলো। আমি একটি কাজের জন্য উঠতে লাগলে সে পাখার রশি নিজের দিকে খুব জোরে টেনে ধরে, যাতে পাখা আমার মাথায় বাড়ি না খায়। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, এমন করো না। আমি যদি পাখার জায়গা খালি দেখে দাঁড়িয়ে যাই আর হঠাৎ তোমার হাত থেকে রশি ছুটে যায়, তাহলে পাখা মাথায় এসে লাগবে। বরং রশি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যাতে পাখা স্বস্থানে এসে স্থির হয়ে যায়, তারপর যে উঠবে সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে উঠবে।

আদব–৬৭ ঃ মেহমান যদি মরিচ কম খায় বা বেছে খায় তাহলে পৌঁছেই মেযবানকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। কতক লোক দস্তরখানে খাবার এলে তখন নাক ছিটকায়।

আদব–৬৮ ঃ দস্তরখানে কোন কোন সময় চিনিও থাকে। তখন কতক খাদেম এমনভাবে পাখা ঝুলায় যে, চিনির পাত্র থেকে চিনি উড়তে আরম্ভ করে। আর কখনো চিনির পাত্র থেকে চামচে করে চিনি নেওয়ার সময় চামচ থেকে চিনি উড়তে থাকে। তাই খাদেমের এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত।

আদব–৬৯ ঃ আমার ভাইয়ের বাড়ী থেকে ডাকে পাঠানোর জন্য ইনভিলাপে ভরা একটি চিঠি তাদের কর্মচারীর হাতে আমার নিকট পাঠানো হয়। আমিই সেটি পাঠাতে বলে এসেছিলাম। কারণ, আমার সাথে ঐ চিঠির সম্পর্ক ছিলো। পথের মধ্যে ঐ কর্মচারী দেখে যে, ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে ষ্টেশনে যাচ্ছে। তখন কর্মচারী একথা চিন্তা করে যে, পোষ্ট অফিসে চিঠি দিলে কাল যাবে, চিঠিটি ঐ পিয়নের নিকট

দিয়ে দেয়। যেন চিঠি আজকেই চলে যায়। ওদিকে আমি চিঠির প্রতীক্ষায় বসে আছি। যখন চিঠি এলো না, তখন আমি খোঁজ করলাম। খোঁজ করে এসব ঘটনা জানতে পারলাম। আমি কর্মচারীটিকে ডেকে উপদেশ দিয়ে বলি যে, তুমি অনুমতি ছাড়া আমানতের মধ্যে কীভাবে হস্তক্ষেপ করলে? আমার নিকট পাঠানোর মধ্যে যে রহস্য ছিলো তুমি তার কী জানো? পিয়নের হাতে চিঠি না দিয়ে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি পাঠানোকে কি কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তুমি তার কী জানো? তুমি তোমার ভুল চিন্তার ফলে এ সমস্ত উপকারিতাকে বরবাদ করেছো। তোমার নাক গলানোর কী দরকার ছিলো? তোমার কাজ শুধু এতটুকু ছিলো যে, চিঠিটি আমার নিকট পৌঁছে দিবে। কর্মচারীটি ভুল স্বীকার করে বলে যে, ভবিষ্যতে আর এমন হবে না।

আদব-৭০ ঃ একজন ছাত্র বাজারে যাওয়ার অনুমতি নিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি একটি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সে আমার অবসর হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে তাগাদা করছিলো, বিধায় তা আমার জন্য বোঝা মনে হচ্ছিলো। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তোমার উচিত ছিলো, আমাকে যখন ব্যস্ত দেখলে, তখন বসে পড়তে। কাজ শেষে হলে তখন কথা বলতে।

আদব-৭১ ঃ একজন মেহমান আমাকে না জানিয়ে হাদীয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার কলমদানীতে দু'টি টাকা রেখে দেয়। আমি আসর নামায পড়ার জন্য চলে যাই। কলমদানী সেখানেই রাখা থাকে। নামাযের পর কোন প্রয়োজনে কলমদানী চেয়ে পাঠাই। তখন তার মধ্যে টাকা দেখতে পাই। জিজ্ঞাসা করা হলে কিছুটা বিলম্ব করে লোকটি একথা স্বীকার করে। আমি একথা বলে সে টাকা ফিরিয়ে দেই যে, যখন তুমি সঠিক পদ্ধতিতে হাদীয়া দিতে জানো না, তখন হাদীয়া দেওয়ারই বা কি দরকার ছিলো? হাদীয়া দেওয়ার নিয়ম কি এই?

প্রথমতঃ হাদীয়া দেওয়া হয় আরাম ও আনন্দ দানের জন্য, আর যখন এর তল্লাশীতে এ পরিমাণ পেরেশানী হলো, তখন তার উদ্দেশ্যই হাতছাড়া হয়ে গেলো।

দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ কলমদানী থেকে টাকাগুলো নিয়ে যেতো, তাহলে না তুমি জানতে পারতে, না আমি জানতে পারতাম। তুমি তো এ ধারণা পোষণ করতে যে, আমি দু' টাকা দিয়েছি। আর আমি তাদ্বারা কোনই উপকৃত হতাম না। ফলে মুফত দয়ার ভার আমার মাথার উপর থাকতো।

তৃতীয়তঃ যদি কেউ নাও নিয়ে যেতো বরং তা আমার হাতেই আসতো, তখনো আমি কি করে জানতাম যে, এটি কে দিয়েছে এবং কাকে দিয়েছে? আর যখন তা জানতে পারতাম না, তখন কয়েকদিন আমানতস্বরূপ রাখতে আমার কষ্ট হতো। তারপর পড়ে পাওয়া জিনিসের খাতে খরচ করা হতো। এ সমস্ত মুসীবত এ লৌকিকতার কারণে দেখা দিলো। সোজা কথা তো হলো, যাকে দেওয়ার সরাসরি তার হাতে দিয়ে দিবে। আর যদি লোকজনের কারণে সংকোচ হয়, তাহলে নির্জনে দিবে। আর যদি নির্জনে দেওয়ার সুযোগ না হয়, তাহলে বলবে যে, আমি একাকী কিছু বলতে চাই। তারপর নির্জনে দিয়ে দিবে। আর যাকে হাদীয়া দেওয়া হয়, তার সমীচীন ঐ হাদীয়ার কথা প্রকাশ করে দেওয়া, হাদীয়াদাতার উপস্থিতিতে হোক, বা তার লজ্জা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার চলে যাওয়ার পর হোক।

আদব-৭২ ঃ এক সফরে এক জায়গার লোকেরা আমাকে ডেকে নেয়। সেখান থেকে যখন বিদায় নিয়ে আসবো, তখন গ্রামের লোকেরা সবাই কিছু কিছু অর্থ একত্র করে হাদীয়া স্বরূপ দিতে ইচ্ছা করে। বিষয়টি জানতে পেরে আমি তাদেরকে এমন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করি।

এর মধ্যে একটি খারাপ দিক তো এই যে, অনেক সময় হাদীয়া সংগ্রহকারী ব্যক্তি এদিকে লক্ষ্য করে না যে, যার থেকে সংগ্রহ করছে সেকি খুশী মনে দিচ্ছে, নাকি তার কথার চাপে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়, খুশি মনে দেওয়ার বিষয়টি যদি লক্ষ্য করেও তবুও হাদীয়া দেওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য—পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধি পাওয়া—তা লাভ হবে না। কারণ, কে হাদীয়া দিলো তাই তো জানা গেলো না।

তৃতীয়, অনেক সময় কোন ওযরবশতঃ কোন কোন হাদীয়া কবুল করা যায় না। সে ওযর বা সমস্যার বিষয়টি হাদীয়াদাতার নিকট থেকেই

যাচাই করা সম্ভব। সম্মিলিত হাদীয়ার মধ্যে এটা যাচাই করাও কঠিন হয়ে থাকে। বিধায় যাকে দেওয়ার দাতা তার হাতে সরাসরি দিবে, বা কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়া স্বউদ্যোগে নিজের কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে পাঠিয়ে দিবে, বা হাদীয়াদাতা হাদীয়ার সাথে চিরকুট লিখে দিবে।

আদব-৭৩ ঃ এক সফরে কিছু লোক আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাদীয়া দিতে আরম্ভ করে। তাদেরকে বুঝিয়ে বলি যে, এমন করা হলে যারা এটা দেখবে, তারা তাদের বাড়ীতে নেওয়ার জন্য হাদীয়া দেওয়াকে জরুরী মনে করবে। তখন গরীব লোক ডেকে নিয়ে সমস্যায় পড়বে, বা না ডেকে আক্ষেপ করতে থাকবে। কারো কোন কিছু দিতে হলে আমার অবস্থান স্থলে এসে কথা বলবে, যাতে আমার স্বাধীন মতামতের মধ্যে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

আদব-৭৪ ঃ এক ব্যক্তি সাহারানপুর থেকে জুমুআর দিন দুপুর বারোটার গাড়ীতে এখানে আসে। আমার এক আত্মীয় তার হাতে কিছু বরফ পাঠিয়ে দেয়। সে ব্যক্তি এমন সময় মাদরাসায় এসে পৌঁছে যে, তখনো ছাত্ররা মসজিদে যায়নি। লোকটি বরফ খণ্ডটি একটি বড় প্লেটের মধ্যে রেখে জামে মসজিদে চলে যায়। জুমুআর পর এক বন্ধু ওয়ায করতে আরম্ভ করেন। ওয়ায করার জন্য আমিই তার নিকট দরখাস্ত করেছিলাম। আমি উপস্থিত থাকলে সে লজ্জাবোধ করবে বিধায় আমি মাদরাসায় চলে আসি। ঐ ব্যক্তি ওয়াযে অংশগ্রহণ করে অনেক বিলম্বে মাদরাসায় আসে। তারপর বরফ এনে আমাকে দেয়। বরফ খণ্ডটি একটি রুমালে জড়ানো ছিলো। প্রথমতঃ এ কাজটিই আমার অপছন্দ হয়। বরফের সাথে কম্বল, চট বা কাঠের গুড়া আনতো। কিন্তু এটি ছিলো, যে ব্যক্তি বরফ খণ্ডটি পাঠিয়েছে তার কাজ। এর এখতিয়ারে এটি ছিলো না। কিন্তু এর করণীয় যে কাজটি ছিলো, তাতেও সে ত্রুটি করেছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ এসেই বরফ বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতো। কোন কারণে এটা যদি বুঝে না এসে থাকে তাহলে নামায শেষে সাথে সাথে চলে আসতো। আর যদি আসতে মন না চেয়ে থাকে তাহলে আমি যখন আসছিলাম, তখন আমাকে জানিয়ে দিতো। আমি তা নিয়ে নিতাম। এখন দু' ঘন্টা পর এসে সেই বরফ আমাকে দিচ্ছে। যার প্রায় পুরাটাই গলে গেছে। শুধু

নামেমাত্র অল্প একটু বরফ রয়ে গেছে। আমি পুরো ঘটনা জানতে পেরে তাকে শাসালাম। তাছাড়া আমার মতে তার বিশেষ স্বভাবের কারণে শুধু শাসানো তার জন্য যথেষ্ট ছিলো না, তাই আমি ঐ বরফ নিতে অস্বীকার করি। যাতে তার চিরদিন মনে থাকে। সে খুব অস্থির হয়ে পড়ে। আমি তাকে বলি যে, তুমি এক ব্যক্তির আমানত বরবাদ করেছো, আর নষ্ট হওয়ার পর আমাকে তা দিতে চাচ্ছো। অনর্থক দয়ার বোঝা আমি মাথায় নিতে চাই না। এখন এর বাকী অংশ তুমি খরচ করো। তোমার হয় আমানত না নেওয়া উচিত ছিলো, আর নিয়েছিলেই যখন, তখন তার হক পুরাপুরি আদায় করা উচিত ছিলো।

আদব-৭৫ ঃ আমি সকালে মাঠ থেকে মাদরাসায় এসে তিন দরজাবিশিষ্ট ঘরটিতে বসি। সেখানে আমার এক আত্মীয় ঘুমাচ্ছিলো। আমি আস্তে করে বসে পড়ি। এক ব্যক্তি চিঠি নিয়ে যাবে, সে যে সমস্ত পত্র ডাকে পাঠাতে হবে, সেগুলো আমাকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসে। আমি সেগুলো দেখে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কাছে দিয়ে দেই। তখন সে চিঠি রাখার ছোট বাক্সের মধ্যে সশব্দে চিঠিগুলো রাখে। ফলে কার্ড বাক্সের সাথে বাড়ী খেয়ে শব্দ করে ওঠে। আমি তাকে উপদেশ দিয়ে বলি, ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

আদব-৭৬ ঃ একবার ইশার নামাযের পর আমি মসজিদে শুয়ে পড়ি। এক অপরিচিত মুসাফির ব্যক্তি এসে আমার পা চাপতে আরম্ভ করে। তার এ পা চাপা আমার জন্য বোঝা মনে হয়। জিজ্ঞাসা করলাম—কে? সে তার নাম-ঠিকানা বললো। কিন্তু আমি চিনলাম না। আমি পা টিপতে নিষেধ করলাম। বললাম যে, প্রথমে মোলাকাত করা উচিত। তারপর অনুমতি নিয়ে খেদমত করায় সমস্যা নেই। তা না হলে খেদমত করায় কষ্ট হয়। আর যদি এর দ্বারা মোলাকাতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মোলাকাতের পদ্ধতি এটা নয়। তারপর আমি তাকে বুঝিয়ে দেই যে, এখন ইশার পর বিশ্রামের সময়। তুমিও বিশ্রাম করো। সকালে দেখা করো। সুতরাং সে সকালে দেখা করলো। তখন পুনরায় বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দেই।

আদব-৭৭ ঃ এক ব্যক্তি তার চিঠিতে কয়েকটি বিষয় লেখে। সাথে এ

কথাও লেখে যে, পাঁচ টাকার মানি অর্ডার পাঠাচ্ছি। টাকার অপেক্ষায় এ কথা চিন্তা করে চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব করি যে, টাকা উসূল হওয়ার পর চিঠির উত্তরের সাথে রসিদও লিখে দেওয়া হবে। এভাবে কয়েকদিন কেটে যায়। অজ্ঞাত কোন কারণে টাকা আর আসে না। ওদিকে চিঠির অন্যান্য বিষয়ের কারণে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হচ্ছিলো। কয়েকদিন পর্যন্ত এই অপেক্ষা ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। অবশেষে তাকে লেখা হয় যে, হয় চিঠিতে টাকা পাঠানোর বিষয়টি না জানানো উচিত ছিলো, বা ঐ চিঠিতে অন্য বিষয়ের উত্তর না চাওয়া উচিত ছিলো।

আদব–৭৮ ঃ এক ব্যক্তি তার ছেলেকে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে মক্তব সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে যে, সেখানকার মুহতামিম সাহেব আমার ছেলেকে বের করে দিয়েছে। আমি নরমভাবে বুঝিয়ে বলি যে, আমার ঐ মক্তবে কোন দখল নেই। সে বললো—আমি শুনেছি যে, তুমি সেখানকার পৃষ্ঠপোষক। আমি বললাম যে, হ্যাঁ, ওখানকার বেতন তো আমার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তবে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই। সে পুনরায় ঐ মুহতামিমের শেকায়েত করতে থাকে। আমি বললাম—এ আলোচনার কোন ফল নেই। এভাবে অভিযোগ করার দ্বারা গীবত শুনানো ছাড়া আর কী লাভ? কিছুক্ষণ পর সে চলে যাওয়ার সময় বিদায়ী মুসাফাহা করতে করতে আবার বলে যে, 'ঐ মুহতামিম আমার ছেলেকে বের করে দিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করেছে।' যেহেতু আমি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহ আসল অবস্থা জানিয়ে তাকে আমার নিকট এই অভিযোগ করতে নিষেধ করেছিলাম তাই তার এই বারংবার অভিযোগ করতে থাকায় আমার রাগ হয়। আমি তাকে কঠোরভাবে ধরে বসি। এবং বলি যে, আফসোস! এতভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও সেই রুচিবিরুদ্ধ নিষ্ফল কথা আবার বলছো। সে তার কথার কিছু ব্যাখ্যা দিতে চায়, কিন্তু সব অর্থহীন। ঐ অবস্থায়ই তাকে বিদায় করে দেই।

আদব–৭৯ ঃ এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলো। ইশার পর যেখানে বসে আমি ওযীফা পাঠ করছিলাম, সে একটু থেমে থেমে এবং আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেদিকে আসছিলো। যার দ্বারা বোঝা

যাচ্ছিলো যে, সে আমার নিকটেই আসতে চাচ্ছে তবে অনুমতির অপেক্ষায় থেমে যাচ্ছে। একে তো ইশার পরে দেখা–সাক্ষাতের সময় নয়। বিশেষ করে সে পূর্বেও সাক্ষাত করেছে। উপরন্তু যখন এ কথাও জানা থাকে যে, তার এখানে বিশেষ কোন কাজ নেই, কেবলই মজলিস ও দরবার জমানোর উদ্দেশ্যে আসছে—যেমন বেশীর ভাগ মানুষের এ অভ্যাস আছে। তাছাড়া ওযীফা পড়ার সময় অন্যমনস্ক হওয়া কষ্টকর বিষয়। বিশেষ করে বিনা প্রয়োজনে। আবার অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিলো যে, সে অনুমতি নেওয়ার জন্য এমন করছে, তাই তার সাথে কথা বলারও মনে ইচ্ছা জাগছিলো। এ সমস্ত বিষয় একত্রিত হয়ে আমার অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ওযীফা বন্ধ করে বলতে বাধ্য হই যে, সাহেব ! এখন কাছে বসার সময় নয়। সে বললো—আমি তো পানি পান করতে যাচ্ছিলাম। এতে আরো অধিক কষ্ট হয় যে, বানিয়ে কথা বলছে। কিন্তু সে বলে যে, বাস্তবেই পানি পান করতে যাচ্ছিলাম। আমি তখন বললাম যে, তাহলে এমন রূপ কেন ধরলে যে, সন্দেহ সৃষ্টি হয়? তোমার না থেমে অন্যদিক দিয়ে সোজা চলে যাওয়া উচিত ছিলো।

আদব–৮০ ঃ একজন ছাত্র—যেমন ধরুন 'যায়েদ'—আমার নিকট অনুমতি চাইলো যে, অমুক ছাত্রের—যেমন ধরুন 'আমর'এর—সাথে বিকালবেলা মাঠে ঘুরতে যাবো। ওদিকে দ্বিতীয়জন অর্থাৎ, আমরের সাথে অন্য একজন কমবয়সী ছাত্র—যেমন ধরুন 'বকর'—উস্তাদের অনুমতিক্রমে আগে থেকে মাঠে যায়। আমাদের মতে বকরের সাথে যায়েদের একত্র হওয়ায় সমস্যা রয়েছে। তাই যায়েদের দায়িত্বে জরুরী ছিলো যে, সে অনুমতি চাওয়ার সময় এ কথাও আমাকে বলা যে, তার সাথে বকরও (প্রায়ই) গিয়ে থাকে। যাতে পুরো বিষয়টির প্রতি নজর দিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কিন্তু জানিনা, সে ইচ্ছা করে নাকি অবহেলা করে বিষয়টি গোপন করে। এমতাবস্থায় তার আবেদন রক্ষা করায় কোন সমস্যা নাই মনে করে আমি অবশ্যই অনুমতি দিতাম। তখন এটা বড় ধরনের একটা প্রতারণা হতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিষয়টি আমার জানা ছিলো, তাই বিষয়টি তখন আমার স্মরণ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরের সাথে আরো কেউ যায় কি? সে

বললো—বকর যায়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে সে কথা তুমি আগে বললে না কেন? ধোঁকা দিতে চাচ্ছিলে? আমি তার এ অপরাধের কারণে খুব তিরস্কার করি। তাকে বুঝিয়ে দেই যে, সাবধান! যাকে নিজের মুরুব্বী এবং কল্যাণকামী মনে করো, তার সঙ্গে কখনোই এমন আচরণ করা উচিত নয়।

আদব-৮১ ঃ একজন ছাত্রের নিকট একজন কর্মচারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, সে কী করছে? সে বললো যে, ঘুমাচ্ছে। পরে জানতে পারি যে, নিজ কক্ষে সে জাগ্রত ছিলো। এ প্রেক্ষিতে ঐ ছাত্রকে শাসন করে বলি যে, একে তো শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে কোন বিষয়কে নিশ্চিত করে বলা ভুল। তোমার সন্দেহ থাকলে এভাবে বলতে যে, সে হয়তো ঘুমাচ্ছে। আর পুরাপুরি সঠিক হতো যদি বলতে যে, আমি জানি না, দেখে এসে বলছি। তারপর জেনে এসে সঠিক উত্তর দিতে। দ্বিতীয়ত, তার জাগ্রত থাকার কথা যদি পরে আমি না জানতে পারতাম এবং এ ধারণায় থাকতাম যে, সে ঘুমাচ্ছে, তাহলে বিনা প্রয়োজনে ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো এবং তার আরামে ব্যাঘাত ঘটানো নির্দয় আচরণ মনে করে তাকে জাগাতাম না। ফলে তখন হয়তো কোন জরুরী কাজের ক্ষতি হয়ে যেতো। যে ক্ষতি এ কারণে আমি মেনে নিতাম যে, ঘুমন্তকে জাগানো আরো অধিক কষ্টকর। পরবর্তীতে যখন জানতে পারতাম যে, সে ঘুমাচ্ছিলো না, তখন ঐ ক্ষতির কারণে মনে কষ্ট হতো। ফলে যে বলেছিলো যে, ঘুমাচ্ছে তার উপর রাগ হতো। এতোগুলো কষ্ট ও পেরেশানী হতো। তাই এ ব্যাপারে সবসময় সাবধান ও সতর্ক থাকা উচিত।

একজন ছাত্র কর্তৃক লিখিত এবং লেখক কর্তৃক সংশোধিত কয়েকটি আদব

আদব-৮২ ঃ একবার এক ব্যক্তি এলো। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী উদ্দেশ্যে এসেছেন, কিছু বলবেন কি? সে উত্তরে বললো—জি না। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম। তারপর লোকটির চলে যাওয়ার সময় হলে মাগরিবের পর ফরয ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী

সময়ে সে হযরতের নিকট তাবীজ চেয়ে বসলো। হযরত বললেন—প্রত্যেক কাজের জন্য উপযুক্ত সময় ও ক্ষেত্র রয়েছে। এটি তাবীজ দেওয়ার সময় নয়। যখন আপনি এসেছিলেন, তখনই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন। আপনি বলেছিলেন—এমনিই সাক্ষাত করতে এসেছি। এখন আবার এ হুকুম কেন করছেন? ঐ সময় জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথেই বলা উচিত ছিলো। মানুষ প্রয়োজনের কথা সময় মত না বলাকে আদব মনে করে। আমার মতে এটি মারাত্মক বেয়াদবী। এর অর্থ তো এই যে, অপর ব্যক্তি আমার চাকর। যখন ইচ্ছা হুকুম করবো, তার তা পালন করতে হবে। এখন আপনিই একটু চিন্তা করে দেখুন, আমার এখন কত কাজ। প্রথমত, সুন্নাত ও নফল নামাযসমূহ পড়তে হবে। তারপর মুরীদদের কিছু কথা রয়েছে, সেগুলো শুনতে হবে। মেহমানদের খানা খাওয়াতে হবে।

আফসোস, বর্তমান যামানায় আদব-কায়দা ও ভদ্রতা-সভ্যতা দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠে গেছে। এখন যান, তাবীজ নেওয়ার জন্য আবার আসবেন। মনে রাখবেন! যেখানে যাবেন, প্রথমে যাওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবেন। বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করলে আর গোপন করবেন না। আমি তো প্রত্যেককে আসার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করি। যাতে করে তার যা বলার আছে, বলে দেয়। তারও যেন সমস্যা না হয় এবং আমারও যেন ক্ষতি না হয়। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে এজন্য জিজ্ঞাসা করি যে, বেশীর ভাগ মানুষই কোন না কোন প্রয়োজন নিয়ে আমার কাছে এসে থাকে। আর তাদের কেউ কেউ লজ্জা ও সংকোচের কারণে নিজের থেকে বলতে পারে না। বা লোকজন থাকার কারণে তাদের গোপন কথা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করলে তার প্রয়োজনের কথা জানায় বা বলে যে, গোপনে বলতে হবে। তখন আমি সুযোগমত আলাদা ডেকে নিয়ে তার কথা শুনে থাকি। কিন্তু কেউ যদি মুখই না খোলে তাহলে আমি কি করে জানতে পারবো। আমার তো আর গায়েবের ইলম নেই।

আদব-৮৩ ঃ একজন মুরীদের চাহিদার ভিত্তিতে তাকে মাগরিবের পরের সময় দেই। এ সময় তাকে কিছু তা'লীম দেবো। সে কিছুটা দূরে

ছিলো বলে তাকে আওয়াজ দিয়ে কাছে ডাকি। সে ব্যক্তি মুখে কিছুই না বলে নিজের জায়গা থেকে উঠে আমার নিকট আসতে থাকে, যা আমি বুঝতে পারিনি। ডাক শোনে নাই মনে করে আমি পুনরায় তাকে সজোরে ডাক দেই। ইতিমধ্যে সে আমার কাছে চলে আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্ কারণে আমার ডাকের উত্তর দেননি, নাকি আমাকে উত্তরদানের যোগ্য মনে করেননি? উত্তর দিলে আহবানকারী বুঝতে পারে যে, আহুত ব্যক্তি তার আহবান শুনতে পেয়েছে। আর উত্তর না দিলে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ডাকতে হয়, ফলে তার কষ্ট হয়। শুধুমাত্র আপনার অলসতা ও উদাসিনতার ফলে ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে অন্যের কষ্ট হলো। আপনি 'হাঁ' বলে সাড়া দিলে এমন কী জটিলতা ছিলো? আজকাল ইলমের শিক্ষা তো সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু আখলাকের শিক্ষা বিরল ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। এখন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আপনাকে পরে সময় দেওয়া হবে, তখন এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।

আদব-৮৪ ঃ হযরতের তা'লীম দেওয়ার মাঝখানে কথা শেষ না হতেই একজন মুরীদ তার স্বপ্ন বলতে আরম্ভ করে। তখন হযরত বলেন—এ কেমন আচরণ? এক কথা শেষ না হতেই তার মধ্যে আরেক কথা আরম্ভ করেছো। কবি বলেন—

سخن را سرست اے خردمندان بن — میاں در سخن درمیان سخن
خداوند تدبیر وفرہنگ وہوش — نگوید سخن درمیان سخن

অর্থ ঃ 'হে বুদ্ধিমান! কথারও মাথা আছে। তাই কথার মাঝখানে কথা বলতে এসো না। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ কথার মাঝে কথা বলে না।'

আমার কথার মাঝে আপনার কথা বলার অর্থ এই যে, আপনার উদ্দেশ্য ছিলো স্বপ্নের কথা বলা। তা'লীম ও তালকীন আপনার নিকট অর্থহীন। তাই আমার এতক্ষণের আলোচনা বিফল হলো। আগামীতে এমন আচরণ আর কখনো করবেন না। এখন চলে যান। অন্য সময় তা'লীম দেওয়া হবে। এখন আপনি তা'লীমের অবমূল্যায়ন করেছেন।

ছাত্র কর্তৃক লিখিত আদবসমূহ শেষ হলো।

আদব-৮৫ ঃ তোমার সঙ্গে কেউ কথা বললে অমনোযোগী হয়ে কথা শুনো না। এতে তার মন নিরুৎসাহী ও নির্জীব হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি তোমারই উপকারের জন্য কোন কথা বলে বা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। আরো বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি তোমার তা'লীম ও ইসলাহের সম্পর্ক থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অমনোযোগী হওয়া অধিকতর দোষণীয়।

আদব-৮৬ ঃ যে ব্যক্তির নিকট তুমি নিজেই নিজের দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনের কথা তুলে ধরো, আর সে তোমার কাছে সে বিষয়ে কিছু জানতে চায়, তাহলে তাকে তুমি অস্পষ্ট উত্তর দিও না। তার সাথে ঘুরিয়ে কথা বলোনা, যার ফলে তার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, বা জটিলতা ও পেরেশানী সৃষ্টি হয়। বারংবার জিজ্ঞাসা করায় অনর্থক তার সময় নষ্ট হয়। কারণ, সে তোমার স্বার্থেই জিজ্ঞাসা করছে। তার নিজের কোন স্বার্থ নেই। যদি তাকে পরিষ্কার উত্তর দেওয়ার তোমার ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে তার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা নাই বলতে। নিজেই এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারপর নিজেই তাকে বিরক্ত করলে।

আদব-৮৭ ঃ কোন বিষয়ে আলোচনার সময় প্রতিপক্ষ তোমার যে যুক্তি–প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছে বা তোমার যে দাবীর বিপরীত কথা সে প্রমাণ করেছে, তার প্রমাণের উপর তোমার কথা বলায় তো সমস্যা নেই, কিন্তু ঠিক পূর্বোক্ত দাবী বা দলিলেরই পুনরাবৃত্তি করায় প্রতিপক্ষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ বিষয়টির প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।

আদব-৮৮ ঃ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কর্মরত মানুষের নিকট বিনা প্রয়োজনে বেকার মানুষ বসে থাকলে তার মন অন্যমনস্ক ও বিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ করে তার কাছে বসে যদি তাকে দেখতে থাকে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

আদব-৮৯ ঃ বিল্ডিংয়ের কোন কোন পাইপ বা নালা সড়কমুখী থাকে, যা শুধুমাত্র বর্ষাকালের জন্য লাগানো হয়ে থাকে। অন্য সময়ে ঐ পাইপ বা নালা দিয়ে পানি ফেললে পথচারীদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদিও তোমার দিকে তাকিয়ে কেউ তোমাকে কিছু বলে না, কিন্তু তোমারও তো অন্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

আদব-৯০ ঃ এক জায়গা থেকে খামে করে পঞ্চাশ টাকার বীমা (পার্শেল) আসে। খাম খোলা ছাড়া কী উদ্দেশ্যে এ অর্থ এসেছে তা জানার উপায় ছিলো না। অপরদিকে খাম খোলার পর এমন কোন উদ্দেশ্য লিখিত থাকার সম্ভাবনা ছিলো, যা আমি পুরা করতে পারবো না। তখন সে টাকা ফেরত পাঠাতে হবে। কিংবা অস্পষ্টতার কারণে তার উদ্দেশ্য বুঝতে সমস্যা হলে সঠিকটা জানার জন্য পুনরায় তার উদ্দেশ্য তার নিকট যাচাই করতে হবে। এটা যাচাই করা পর্যন্ত সে টাকা বিনা প্রয়োজনে আমানত রাখতে হবে। আর ফেরত পাঠাতে হলে অনর্থক আমাকে তার খরচ বহন করতে হবে। কারণ, অনেক সময় এমন হয়েছে যে, আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই আমার রাহ খরচ পাঠিয়ে দিয়েছে, অথচ আমি যেতে পারিনি। কিংবা টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্র অস্পষ্ট থাকার ফলে কিংবা ব্যয়ের ক্ষেত্র স্পষ্ট থাকলেও তার বিশেষ কোন দিক অস্পষ্ট থাকার ফলে এখান থেকে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ওদিকে উত্তর দিতে তারা দেরী করেছে। ফলে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। কর্মব্যস্ত লোকের এতে কষ্ট হয়। তাই বীমার সে খাম আমি ফেরত পাঠাই। আমার মত ব্যস্ত লোকদের সাথে জরুরী আর অন্যদের সাথে উত্তম হলো, এমন ক্ষেত্রে প্রথমে জানিয়ে বা জিজ্ঞাসা করে অনুমতি নিয়ে নিবে, তারপর টাকা পাঠাবে। কিংবা মানিঅর্ডার ফরমে পরিষ্কারভাবে উদ্দেশ্য লিখে দিবে। যাতে প্রাপক উদ্দেশ্য জানতে পারে। তারপর সে চাইলে তা গ্রহণ করবে, না হয় ফেরত পাঠাবে।

আদব-৯১ ঃ জালালাবাদের এক মক্তবের শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়ে। মক্তবের মুহতামিম আমার কাছে দু'-চারদিনের জন্য একজন উস্তাদ পাঠানোর আবেদন করে। আমি নিজে কাউকে যেতে বললে অনিচ্ছা থাকলেও যেতে বাধ্য হবে মনে করে সেই মুহতামিম সাহেবকে বলে দেই যে, এখানে যারা আছে তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। কেউ স্বেচ্ছায় রাজি হলে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। তিনি একজন মুরীদকে রাজি করেন। সেই মুরীদ বলে যে, অমুকের (অর্থাৎ, আমার) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে চলে আসবো। তারপর ঐ মুহতামিম সাহেব চলে যায়। পরের দিন ঐ মুরীদ আমার কাছে এসে নিজের সমস্যার কথা বলে বলছে

যে, আমি যেতে পারবো না। আমি বললাম যে, এ সমস্যার কথা ঐ মুহতামিম সাহেবের নিকট বলা উচিত ছিলো। তার নিকট আমার অনুমতি সাপেক্ষে যাওয়ার ওয়াদা করেছো। এখন হয়তো সে মনে মনে বলবে যে, সে তো আসার জন্য রাজি ছিলো, কিন্তু অমুক ব্যক্তি হয়তো আসতে বারণ করেছে। তুমি আমার উপর দোষ চাপাতে চাও। এ কেমন অশালীন আচরণ। এখন তুমি জালালাবাদ যাও। গিয়ে বলো যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলো, কিন্তু আমার এই সমস্যা রয়েছে, তাই আমি থাকতে পারবো না। সুতরাং তাকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দেই। এ উপদেশ সবার জন্যই প্রযোজ্য। নিজেকে নির্দোষ আর অন্যকে মিথ্যা দোষী সাব্যস্ত করা চরম অন্যায় কাজ।

আদব-৯২ ঃ একবার এক ব্যক্তির এই ঘটনা ঘটে যে, তার অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গেও কিছু কথা ছিলো, আর আমার নিকটেও কাজ ছিলো। উভয় উদ্দেশ্য নিয়েই সে এখানে এসেছিল। সে ঐ ব্যক্তিকে চিনতো না। তাছাড়া সেসময় ঐ ব্যক্তি কাউকে সাক্ষাতও দেয় না। তাই তাকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, সন্ধ্যার সময় তার সাথে সাক্ষাত করো। এ পরামর্শ মত কাজ করার ফলে আর কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু অন্য কিছু মেহমানের এমন ঘটনা ঘটে যে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজে অন্যত্র চলে যায়, সেখান থেকে তাদের আসতে দেরী হয়ে যায়। ফলে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে এখানকার লোকদের কষ্ট হয়। বাড়ীর লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাবার নিয়ে বসে থাকে। ফলে ক্ষতিও হয় আবার কষ্টও হয়। তাই যেখানে প্রত্যাশী ও প্রার্থী হয়ে যাবে, সেখানে অন্য কোন প্রয়োজন না নিয়ে যাওয়া উচিত। অনেক সময় উদ্দেশ্যহীন ব্যস্ততায় জরুরী এবং মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা হয় এবং ক্ষতি হয়।

আদব-৯৩ ঃ অন্য এক ব্যক্তি ইশার পর বললো যে, আমি এক জায়গা থেকে লেপ নিয়ে আসবো। তখন তাকে বলা হলো যে, এ সময় তো মাদরাসার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তুমি ডাকাডাকি করে সবার আরামের ব্যাঘাত করবে। তারপর তাকে কাপড় দেওয়া হলো। তখন তার এ আচরণের জন্য আফসোস হলো যে, সে কি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে? লেপ আনা যখন জরুরী ছিলো, তখন আগে আগেই আনা দরকার ছিলো।

হাদীয়া দেওয়ার আদবসমূহ

আদব-৯৪ ঃ এ শিরোনামের অধীনে হাদীয়ার এমন কিছু আদব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি, যেগুলো মেনে না চলার কারণে হাদীয়ার স্বাদ এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া হাতছাড়া হয়ে যায়।

১. যাকে হাদীয়া দিবে, গোপনে দিবে। তারপর যাকে হাদীয়া দেওয়া হলো তার সমীচীন হলো, তা প্রকাশ করে দেওয়া। এখন অবস্থা তার উল্টা হয়ে গেছে যে, হাদীয়াদাতা প্রকাশ করার এবং গ্রহীতা গোপন করার চেষ্টা করে থাকে।

২. হাদীয়া যদি টাকা-পয়সা না হয়ে কোন দ্রব্য হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব যাকে হাদীয়া দিবে তার পছন্দ জেনে নিয়ে তার পছন্দনীয় জিনিস দিবে।

৩. হাদীয়া দিয়ে বা হাদীয়া দেওয়ার পূর্বে নিজের কোন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না এতে স্বার্থপরতার সন্দেহ হয়ে থাকে।

৪. হাদীয়ার পরিমাণ এত বেশী না হওয়া উচিত যে, যাকে হাদীয়া দেওয়া হবে তার মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। আর হাদীয়া যত কম হোক না কেন ক্ষতি নেই। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের দৃষ্টি পরিমাণের উপর থাকে না, ইখলাসের উপর থাকে। পরিমাণ বেশী হলে তাদের পক্ষ থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. যাকে হাদীয়া দেওয়া হচ্ছে, তিনি কোন কারণে তা ফিরিয়ে দিতে চাইলে তখন তা ফিরিয়ে নিবে এবং ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ জেনে নিয়ে ভবিষ্যতে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু তখন নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। তবে যে কারণে ফিরিয়ে দিচ্ছে তা বাস্তবসম্মত না হলে তা অবাস্তব হওয়ার কথা সাথে সাথে অবগত করানোয় দোষ নেই, বরং উত্তম।

৬. যাকে হাদীয়া দিবে তার নিকট নিজের নিষ্ঠা প্রমাণ না করা পর্যন্ত হাদীয়া দিবে না।

৭. যথাসম্ভব রেলওয়ে পার্সেল যোগে হাদীয়া পাঠাবে না। কারণ, এতে যাকে হাদীয়া দেওয়া হয় তার নানাপ্রকারের কষ্ট হয়ে থাকে।

চিঠিপত্রের আদবসমূহ

আদব-৯৫ ঃ এ শিরোনামের অধীনে চিঠিপত্রের কিছু আদব লিখছি—

১. চিঠির ভাষা, বিষয় ও লেখা খুব স্পষ্ট হওয়া উচিত।

২. প্রত্যেক চিঠিতে নিজের পূর্ণ ঠিকানা লেখা জরুরী। ঠিকানা মুখস্থ রাখা প্রাপকের দায়িত্ব নয়।

৩. চিঠিতে পূর্বের কোন চিঠির কোন বিষয়ের উদ্ধৃতি দিতে হলে ঐ বিষয়ের উপর দাগ টেনে পূর্বের চিঠিও সাথে পাঠিয়ে দিবে। যেন তা মনে করার জন্য চিন্তা করতে কষ্ট না হয়। আর অনেক সময় তো ঐ বিষয়ই মনে পড়ে না। তাই সাথে পূর্বের চিঠি দিয়ে দিবে।

৪. এক চিঠিতে এতো অধিক প্রশ্ন করবে না যে, উত্তরদাতার উপর বোঝা হয়। চার-পাঁচটি প্রশ্নও অনেক। অবশিষ্ট প্রশ্ন প্রথমগুলোর উত্তর আসার পর পাঠিয়ে দিবে।

৫. কর্মব্যস্ত লোকের নিকট চিঠি পাঠালে তাকে অন্যের নিকট সংবাদ বা সালাম পৌছানোর দায়িত্ব দিবে না। একইভাবে নিজের কোন মুরুব্বীজনকেও এ কষ্ট দিবে না। সরাসরি তাদের নিকট চিঠি লিখে যা জানানোর নিজে জানাবে। আর যে কাজ প্রাপকের জন্য মোনাসেব নয়, এমন কিছুর ফরমায়েশ করা তো আরো বেয়াদবী।

৬. নিজের স্বার্থে বিয়ারিং চিঠি পাঠাবে না।

৭. বিয়ারিং উত্তরও চেয়ে পাঠাবে না। অনেক সময় পিয়ন এ ব্যক্তিকে পায় না, ফলে সে চিঠি ফেরত পাঠায়, তখন উত্তরদাতার ঘাড়ে অনর্থক জরিমানার বোঝা পড়ে।

৮. উত্তরদানের জন্য রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো অভদ্রতা। হেফাযতের ক্ষেত্রে তো তা অরেজিষ্ট্রি উত্তরপত্রের সমান হয়ে থাকে। অধিকন্তু তা প্রাপক নিয়ে অস্বীকার করতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, চিঠি নিজের শ্রদ্ধাভাজনের নিকট পাঠানো হচ্ছে। তাই এর অর্থ যেন এই দাঁড়ালো যে, তার ব্যাপারেও মিথ্যা বলার সন্দেহ করা হচ্ছে। এটা কত বড় বেয়াদবীর কথা !

উপরে প্রায় একশ'টির মত আদব তুলে ধরা হলো। সামাজিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত এ জাতীয় আরো কিছু আদব বেহেশতী যেওরের দশম অংশে লিখে দিয়েছি। সেগুলোও দেখে নিবে। তার মধ্যে থেকে কিছু

আদব একটু পরেই নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

এ সমস্ত আদবের সারকথা হলো, নিজের কোন কাজ, কথা বা অবস্থা দ্বারা অন্যের মনের উপর কোন চাপ, অস্থিরতা বা বিরক্তি সৃষ্টি করবে না। এটিই সদাচরণের মূল কথা। যে ব্যক্তি এ মূলনীতি সামনে রাখবে তার জন্য অধিক বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন পড়বে না। তাই এ তালিকা আর দীর্ঘ করা হলো না। তবে এ মূলনীতি মেনে চলার সাথে সাথে এ কাজটুকুও করতে হবে যে, প্রত্যেক কাজ ও কথার পূর্বে একটু চিন্তা করতে হবে যে, আমার এ আচরণ অন্যের কষ্টের কারণ হবে না তো? এভাবে চিন্তা করলে ভুল খুব কম হবে। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিন পর নিজের স্বভাবের মধ্যেই সঠিক রুচি ও প্রকৃতি জন্মাবে, তখন আর চিন্তাও করতে হবে না। এ সবকিছুই তখন সহজাত বিষয়ে পরিণত হবে।

বেহেশতী যেওর থেকে নেওয়া কিছু আদব

আদব-৯৬ ঃ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে সেখানে এতো দীর্ঘ সময় বসো না বা এতো লম্বা সময় তার সাথে কথা বলো না যে, সে বিরক্ত হয়ে যায় বা তার কাজের ক্ষতি হয়।

আদব-৯৭ ঃ তোমাকে কেউ কোন কাজের কথা বললে তা শুনে হাঁ বা না কিছু একটা অবশ্যই মুখে পরিস্কার করে বলো। যেন যে ব্যক্তি কাজের কথা বললো তার মন একদিকে নিশ্চিত হয়। এমন যাতে না হয় যে, সে তো মনে করলো যে, তুমি শুনেছো অথচ তুমি শোনোনি। কিংবা সে মনে করলো যে, তুমি কাজটি করে দিবে অথচ তোমার করার ইচ্ছা নেই। তাহলে অনর্থক সে লোকটি তোমার উপর ভরসা করে থাকবে।

আদব-৯৮ ঃ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে তাকে কোন জিনিসের ফরমায়েশ করো না। অনেক সময় জিনিস তো হয় সামান্য, কিন্তু সবসময় তো সবকিছু ঘরে থাকে না। ফলে বাড়ীওয়ালা তোমার ফরমায়েশ পুরা করতে না পেরে অনর্থক লজ্জিত হয়।

আদব-৯৯ ঃ লোকসম্মুখে বসে থুথু ফেলো না, নাক পরিস্কার করোনা। প্রয়োজন হলে একদিকে সরে গিয়ে কাজ সেরে আসো।

আদব-১০০ ঃ খাবার খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম নিও না, যা শুনলে মানুষের ঘৃণা হয়। এতে নাজুক প্রকৃতির লোকদের কষ্ট হয়।

আদব-১০১ ঃ রোগীর সম্মুখে বা তার পরিবারের লোকদের সম্মুখে এমন কথা বলো না, যার দ্বারা রোগীর জীবনের ব্যাপারে নিরাশা জন্মায়। এতে অনর্থক মন ভেঙ্গে যায়। বরং শান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলো যে, ইনশাআল্লাহ সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

আদব-১০২ ঃ কারো কোন গোপন কথা বলতে হলে এবং সে লোকও সেখানে উপস্থিত থাকলে চোখ বা হাত দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করো না। এতে অনর্থক তার সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আর একথা তখন, যখন সে কথা বলা শরীয়তের বিধানেও বৈধ হয়। আর যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বলা বৈধ না হয়, তাহলে এমন কথা বলা গুনাহ।

আদব-১০৩ ঃ শরীর ও কাপড় দুর্গন্ধ হতে দিও না। ধোলাই করা অতিরিক্ত কাপড় না থাকলে পরিহিত কাপড়টাই ধুয়ে নাও।

আদব-১০৪ ঃ মানুষকে বসিয়ে রেখে সেখানে ঝাড়ু দেওয়াইয়ো না।

আদব-১০৫ ঃ মেহমানের উচিত পেট ভরলে কিছু খাবার অবশ্যই দস্তরখানে রেখে দিবে। যেন বাড়ীওয়ালার এ সন্দেহ না হয় যে, মেহমানের খানা কম হয়েছে। তাহলে তারা লজ্জিত হবে।

আদব-১০৬ ঃ পথের মধ্যে চৌকি, পিঁড়ি, কোন পাত্র, ইট ইত্যাদি রেখো না।

আদব-১০৭ ঃ হাসির ছলে শিশুদেরকে উপর দিকে ছুঁড়ে মেরো না। জানালা বা অন্যকিছুর সাথে ঝুলিয়ে দিও না, তাহলে পড়ে যেতে পারে।

আদব-১০৮ ঃ গোপন জায়গায় কারো ফোড়া বা ঘা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করো না যে, কোথায় হয়েছে?

আদব-১০৯ ঃ আঁটি বা ছিলকা কারো মাথার উপর দিয়ে নিক্ষেপ করো না।

আদব-১১০ ঃ কারো হাতে কিছু দিতে হলে দূর থেকে নিক্ষেপ করো না যে, সে হাত দিয়ে ধরে ফেলবে।

আদব-১১১ ঃ যার সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার বাড়ীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করো না।

আদব-১১২ ঃ কারো দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা বা রোগ-ব্যাধির কোন সংবাদ শুনলে ভালোভাবে যাচাই না করে কাউকে বলো না। বিশেষ করে তার আত্মীয়-স্বজনকে।

আদব-১১৩ ঃ দস্তরখানে সালুন (বা অন্য খাবার) দেওয়ার প্রয়োজন

হলে আহারকারীদের সম্মুখ থেকে সালুনের (খাবারের) পাত্র নিয়ে যেয়ো না। অন্য পাত্রে সালুন নিয়ে এসো।

আদব-১১৪ ঃ শিশুদের সামনে নির্লজ্জতার কোন কথা বলো না।

বেহেশতী যেওর থেকে নেওয়া আদবসমূহ শেষ হলো। এ পর্যন্ত উল্লেখিত বেশীর ভাগ আদব এমন ছিলো, যেগুলোর প্রতি সমকক্ষ বা বড়দের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা জরুরী। এখন দু'–চারটি আদব এমনও উল্লেখ করছি, যেগুলোর প্রতি বড়দের ছোটদের সঙ্গে লক্ষ্য রাখা উচিত বা জরুরী।

বড়দের জন্য জরুরী আদবসমূহ

আদব-১১৫ ঃ বড়দেরও খুব রুক্ষ মেযাজের হওয়া উচিত নয় যে, কথায় কথায় রাগ করবে। কথায় কথায় জ্বলে উঠবে। এটি নিশ্চিত কথা যে, অন্যেরা যেমন তোমার সঙ্গে অশোভন আচরণ করে, তুমিও যদি তোমার বড়দের সঙ্গে চলাফেরা করো, তাহলে তোমার থেকেও তাদের সঙ্গে অনেক অশোভন আচরণ হবে, একথা মনে করে কিছু ছাড় দিও। একবার, দু'বার নরমভাবে বুঝিয়ে দাও। এর দ্বারাও কাজ না হলে তার কল্যাণের নিয়তে কঠোর ও শক্ত আচরণেও দোষ নেই। তুমি যদি সবর না করো, তাহলে সবরের ফযীলত থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ যখন তোমাকে বড় বানিয়েছেন, তখন সব ধরনের লোক তোমার নিকট আসবে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন বুদ্ধির লোক থাকবে। সবাই এক সমান কি করে হবে?

নিম্নের হাদীসটি খুব মনে রাখা দরকার—

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَا هُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَا هُمْ.

অর্থ ঃ 'যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুমিন থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।'

আদব-১১৬ ঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে লক্ষণ দ্বারা তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা জন্মে যে, সে তোমার কথা কখনোই অমান্য করবে না

তাহলে তাকে এমন কোন জিনিসের ফরমায়েশ করো না, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়।

আদব-১১৭ ঃ তোমার বলা ছাড়াই কেউ যদি তোমার আর্থিক বা শারীরিক খেদমত করে, তবুও লক্ষ্য রেখো যেন তার বিশ্রামের বা সুবিধার ব্যাঘাত না ঘটে। অর্থাৎ, তাকে বেশী জাগতে দিও না। তার সামর্থ্যের অধিক হাদীয়া নিও না। সে তোমাকে দাওয়াত করলে অনেক বেশী খাবার পাক করতে দিও না। তোমার সাথে অনেক মানুষকে দাওয়াত দিতে দিওনা।

আদব-১১৮ ঃ কারো প্রতি ইচ্ছাপূর্বক অসন্তুষ্ট হতে হলে বা ঘটনাক্রমে এমনটি হয়ে গেলে পরের দিন তাকে খুশী করে দাও। তোমার থেকে বাস্তবিকই বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে অকপটে ভুল স্বীকার করে তার কাছে মাফ চেয়ে নাও। লজ্জা করো না। কিয়ামতের দিন সে আর তুমি এক সমান হয়ে যাবে।

আদব-১১৯ ঃ কথাবার্তা বলার সময় কারো অসমীচীন আচরণের কারণে মেযাজ বেশী চড়া হতে থাকলে তার সাথে সরাসরি কথা না বলা উত্তম। অন্য কোন যোগ্য ও বিজ্ঞ লোককে ডেকে তার মধ্যস্থতায় কথা বলবে। যেন তোমার চড়া মেযাজের প্রভাব তার উপর এবং তার অসমীচীন আচরণের প্রভাব তোমার উপর না পড়ে।

আদব-১২০ ঃ নিজের কোন খাদেম বা মুরীদকে নিজের এমন নিকটতম বানিও না যে, অন্যেরা তার চাপে থাকে, বা সে অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। একইভাবে সে যদি অন্যের কথা ও অবস্থা তোমার নিকট বলতে আরম্ভ করে তাহলে তাকে বারণ করে দাও। তা না হলে মানুষ তাকে ভয় করতে থাকবে। আর তুমি মানুষের প্রতি কুধারণা পোষণকারী হয়ে যাবে। একইভাবে সে যদি কারো পয়গাম বা সুপারিশ তোমার নিকট নিয়ে আসে, তাহলে কড়াভাবে নিষেধ করে দাও। যেন মানুষ তাকে মাধ্যম মনে করে তার তোষামোদ করতে আরম্ভ না করে। তাকে নজরানা দিতে আরম্ভ না করে। বা সে মানুষদেরকে ফরমায়েশ করতে আরম্ভ না করে। সারকথা এই যে, সব লোকের সম্পর্ক সরাসরি নিজের সাথে রাখবে। কোন ব্যক্তিকে মাধ্যম বানাবে না। হাঁ, নিজের

খেদমতের জন্য এক–আধ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে নাও, তাতে দোষ নেই। কিন্তু তাকে অন্যান্য লোকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দখল দিও না।

এমনিভাবে মেহমানদের বিষয় কারো উপর ছেড়ে দিও না। নিজেই সবার দেখাশোনা করো। খোঁজখবর নাও। যদিও এতে তোমার কষ্ট বেশী হবে। কিন্তু অন্যদের তো আরাম ও সুবিধার ব্যবস্থা হলো। আর বড় তো কষ্ট সহ্য করার জন্যই হয়ে থাকে।

জনৈক কবি কত সুন্দর বলেছেন—

آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی
کانگشت نمائے عالمے خواہد شد

অর্থ ঃ 'যেদিন তুমি চাঁদ হয়েছো, সেদিন কি তুমি জানো না যে, সারা বিশ্বের আঙ্গুল তোমার প্রতি উত্থিত হবে?'

এখন এ সমস্ত আদব ও নিয়ম–নীতিকে একটি অনিয়মের নিয়মের উপর খতম করছি। তা এই যে, এর মধ্যে কিছু আদব তো সবার জন্য এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। আর কিছু আদব আছে এমন, যা থেকে এমন খাদেম এবং মাখদুম (গুরুজন) ব্যতিক্রম, যাদের সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে। কার সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আর কার সাথে ওঠে নাই, তা রুচি ও উপলব্ধির দ্বারা বুঝতে পারবে। তাই এ বিষয়ক আদব ও রুচিও উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিচ্ছি। এখন এ পুস্তিকাকে কৃত্রিমভাবে আদব ও কৃত্রিম আদব সম্বলিত একটি কবিতা লিখে সমাপ্ত করছি।

طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا اٰدَابٌ
اَدِّبُوا النَّفْسَ اَيُّهَا الْاَصْحَابُ

অর্থ ঃ 'প্রেমের পথ পুরোটাই আদবসমৃদ্ধ। তাই বন্ধুগণ! নফসকে আদবে সজ্জিত করো।'

থানাভোনে ১৩৩২ হিজরীর মুহাররম মাসের ৮ তারিখে যেদিন 'আগলাতুল আওয়াম' পুস্তিকা শেষ হয়েছে, সেদিন এ পুস্তিকাও শেষ হয়েছে। পুস্তিকাদ্বয়ের মধ্যে এক ঘন্টার কিছু বেশী এবং দু' ঘন্টার কিছু কম সময়ের ব্যবধান হয়েছে।